শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
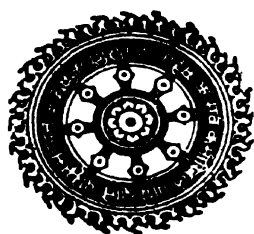
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রকাশক ঃ
শ্রীমানসপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি।
৩, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

মুদ্রাকর ঃ শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই বিডন রো
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

পরিচয়

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তে গঠিত সাধকের, জীবন ও সাধনমার্গে উত্তরোত্তর মন কিরূপ পরিবর্ধিত হয়, তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আভাষ এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আদর্শ করিয়া তাঁহার আশ্রিত সাধক-মণ্ডলী কিরূপে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি কিরূপ অকপট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল তাহাই দেখান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বাদানুবাদ, মতামত বা ঘটনার তারতম্যে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সাধকই সাধকের জীবন উপলব্ধি করিতে পারেন। বিপরীত ভাবের ভিতর একভাব, অনন্তস্রোত আবহমানকাল হইতে চলিতেছে। আদিকালের সাধক ও বর্তমানকালের সাধক একই, কোনরূপ তারতম্য হয় না। সাধক জীবনী হইতেছে ধারাবাহিক তপস্যাসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন রুদ্রাক্ষগুলিকা। এই গ্রন্থ পাঠে যদি কোন সাধক বা গৃহীর কোন উপকার হয় তাহা হইলে এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ও শ্রম সার্থক মনে করিব। ইতিঃ—

কলিকাতা
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সাল। | শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

Works of Sri Mohendra Nath Dutt

ENGLISH

Religion, Philosophy, Psychology	Price
1. Energy	4·00
2. Mind (In the press)	
3. Mentation	2·50
4. Theory of Vibration	2·50
5. Cosmic Evolution—Part II	4·00
6. Traingle of Love	2·00
7. Formation of the Earth	2.50
8. Metaphysics (2nd. Ed.)	2·50
9. Theory of Motion	2·50
10. Biology –	7·00
11. Logic of Possibilities	4·00
12. Devotion	4·00
13. Ego	6·00
14. Theory of Sound	3·50
15. Theory of Light	5·00
16. Ethics	3 00
17. Thoughts on Religion	4·50
18. Action	3·00
*19. Natural Religion	—
Art & Architecture	
1. Dissertation on Painting (2nd Ed.)	4·00
*2. Principles of Architecture	—
Literary Criticism, Epic, etc.	
1. Language and Grammar &Rhetoric	10·00
2. Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra (2nd. Edition)	1·50
3. Nala and Damayanti	5 00
*4. Kuruskhetra	—
Social sciences	
1. Society	5·00
2. Lectures on Status of Toilers	2·50
3. Homocentric Civilization	2·50
4. Reflections on Society	2·00
5. Temples and Religious.Endowments	1·50
6. Federated Asia	4·50
7. National Wealth	5·50
8. Nation	2·00
9. New Asia	3·00
10. Toilers' Republic	0·50
*11. Rights of Mankind	—

* Books marked with astericks out of print.

*12. Lectures on Enducation —
*13. Status of Women (with Bengali Translation) —
*14. Socical Thoughts —
15 Reflections on woman —

(Published by Saradeswari Ashram)

HINDI

1. Nari-Adhikar 0·75
(Hindi Translation of "Status of Women")
2. Manab-Kendrik Sabhyata 1·00
(Hindi Translation of "Homocentric Civilization")

Books Awaiting Publication

1. Dissertation on Poetry
2. Lectures on Philosophy

বাংলা

অনুধ্যান দর্শন প্রভৃতি	মূল্য
১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান	১০·০০
২। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড,	৮·০০
৩। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, (২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে)	১৫·০০
৪। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড,	১৫·০০
৫। ঐ ২য় খণ্ড	১০·০০
৬। ঐ ৩য় খণ্ড	৪·০০
৭। স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী	৩·৫০
৮। কাশীধামে বিবেকানন্দ	৪·০০
৯। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী	১৩·০০
১০। শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	১·০০
*১১। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ	—
*১২। দীন মহারাজ	—
*১৩। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ)	—
১৪। সাধুচতুষ্টয় (সারদেশ্বরী আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত।	
১৫। জে. জে. গুডউইন (স্বামীজীর ক্ষিপ্র লিপিকার), (যন্ত্রস্থ)	—

১৬। ব্রজধাম দর্শন ৩'৫০

১৭। নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন) ২'০০

১৮। বদরীনারায়ণের পথে, (যন্ত্রস্থ) —

১৯। মায়াবতীর পথে ১ ৫০

২০। তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান ৩'৭০

২১। মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান ৮'০০

২২। অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান ৮'০০

২৩। ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন ১'৫০

*২৪। গুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান —

*২৫। মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা) —

*২৬। মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) —

কাব্য সমালোচনা প্রভৃতি

১। পশুজাতির মনোবৃত্তি ১'০০

২। পাশুপাত অস্ত্রলাভ (কাব্য) ৫'০০

৩। গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)

৪। সঙ্গীতের রূপ ১'৫০

৫। নৃত্যকলা ১'০০

৬। বিবিধ কবিতাবলী ০'৫০

৭। কাব্য অনুশীলন ১'০০

৮। কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা ৬'০০

৯। প্রাচীন জাতির দেবতা ও বাহনবাদ ৩'০০

১০। প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ কাহিনী ও ইহুদী জাতির ইতিহাস ১'৫০

১১। দৌত্য কার্য ৬ ০০

*১২। বাংলা ভাষার প্রধাবন —

*১৩। শিল্প প্রসঙ্গ —

*১৪। খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার —

* তারকা চিহ্নিত পুস্তকগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না।

*১৫। বৃহন্নলা (কাব্য)

*১৬। প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাহিনী

*১৭। ঊষা ও অনিরুদ্ধ

Allied Publications

১। স্মৃতি-তর্পণ — ৩·৫০

শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

২। স্মৃতি-কথা — ১·২৫

শ্রীসাতকড়ি মিত্র

৩। আমার দেখা মহিমবাবু — ১·০০

শ্রীরঘুনাথ বসু

৪। বিবিধ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ — ২·৫০

শ্রীমানসপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

৫। শতবার্ষিকী লেখমালা। — ৫·০০

৬। পুণ্যদর্শন মহেন্দ্র নাথ প্রসঙ্গে — ৩·০০

শ্রীসত্যচরণ দত্ত

*৭। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ। — —

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক

৮। সংলাপে মহেন্দ্রনাথ ১ম খণ্ড* — —

" " ২য় খণ্ড — ১০·০০

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বসু

(গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া মহেন্দ্র দর্শনের ভূমিকায় পরিচিত হউন)।

9. Labour and Capital — 1·00

Sri R. K. Ghosh

10. Education in Free India — 0·37

Sri S. K. Ghosh

11. Dialectics of Land-Economics of India — 40·00

Sri Bhupendra Nath Dutta
A. M. (Brown) Dr. Phil (Hamburg)

The Mohendra Publishing Committee
3, Gourmohan Mukherjee Street
Calcutta-700006
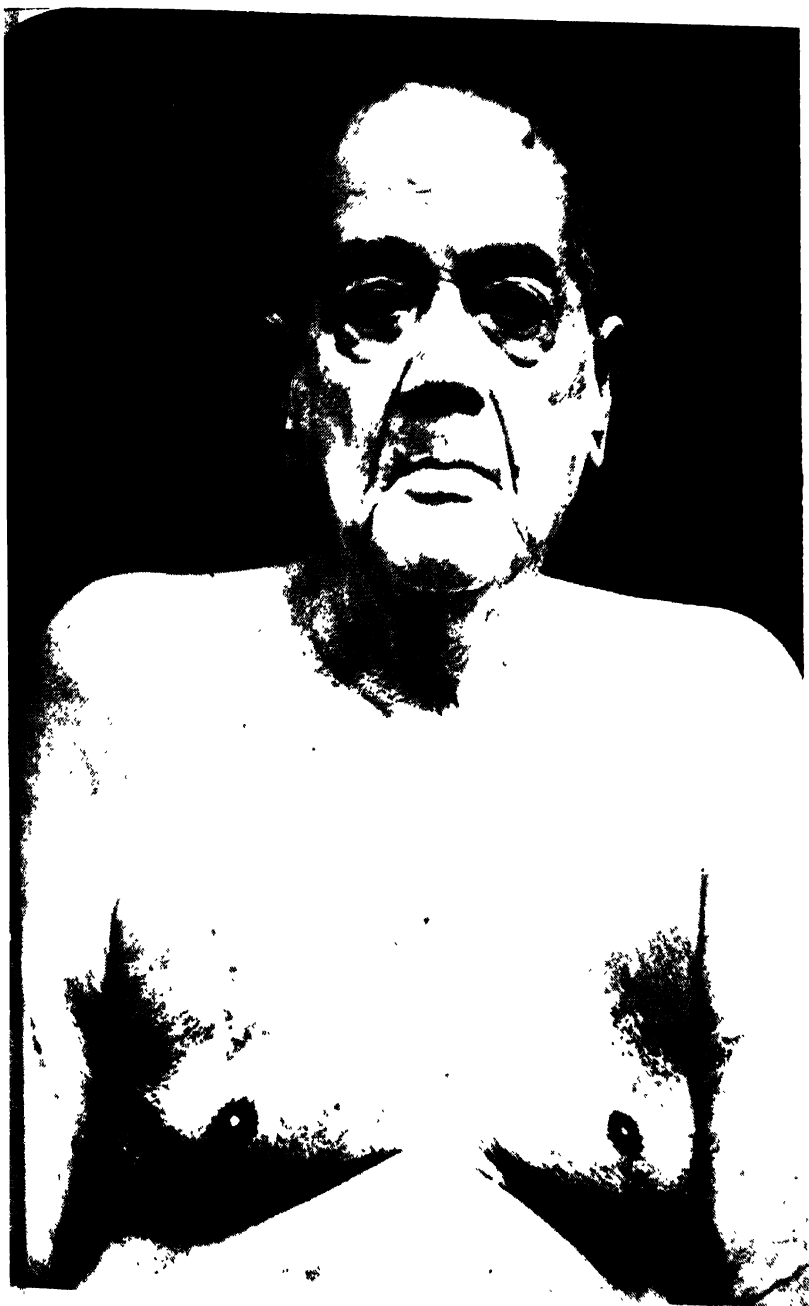
SRI MOHENDRA NATH DUTT

আলমবাজার মঠ

স্বামী সারদানন্দ—বরাহনগর মঠের পর আলমবাজারের মঠ হয়। বরাহনগর মঠের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৮৯১ সালে কালীকৃষ্ণমহারাজ বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পরে শরৎমহারাজের সহিত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিবার জন্য উভয়ে জয়রামবাটীতে যাত্রা করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে উভয়ে আলমবাজারের মঠে আসিলেন এবং যে ঘরটি ঠাকুরঘর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই ঘরটিতে শুইয়া রহিলেন। আলমবাজারের মঠে প্রথম দুই বা তিন সপ্তাহ শশীমহারাজের ঘর বলিয়া যাহা পরে পরিচিত হইয়াছিল, তথায় ঠাকুরঘর হইয়াছিল। উহার চারিদিকে রেডির তেলের কারখানা ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরে সর্বদা রেড়ির তেলের গন্ধ আসিত বলিয়া ঐ ঘরটি পরিত্যাগ করিয়া মাঝের ঘরটিতে ঠাকুরের দ্রব্য পরে আনা হইয়াছিল।

সারদানন্দ স্বামীর বর্তমান লেখককে চা খাওয়াইবার ইচ্ছা।—শরৎমহারাজ ও কালীকৃষ্ণমহারাজের খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে। ঘরের মেঝেতে কম্বল মুড়ি দিয়া হি হি করিয়া দু'জনে কাঁপিতেছেন। শীতও একটু একটু আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমান লেখক বেলা পাঁচটার সময় প্রথম দিন আলমবাজারের মঠে গেলেন। সাত আট দিন হইল বরাহনগর হইতে আলমবাজারে মঠ উঠিয়া আসিয়াছে। বর্তমান লেখক গিয়া শরৎমহারাজ ও কালীকৃষ্ণমহারাজের নিকট বসিলেন। শরৎমহারাজের জ্বর তখন সবেমাত্র ছাড়িবার উপক্রম হইতেছে। নূতন বাড়ি, সব দিক জানাশুনাও নাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে, আলোর কোন বন্দোবস্ত নাই, সবই অনিশ্চিত। হঠাৎ শরৎমহারাজের মনে কি এক

ভাব উঠিল, তিনি কম্বলের উপর উঠিয়া বসিলেন। জ্বরটা সবে ছাড়িবে, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল, হাত পা ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না, তখনও সমস্ত শরীরটা কাঁপিতেছে। অতি করুণ ও কাতরস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ভাই তোমায় একটু চা করে খাওয়াব।" তুমি চা বড় ভালবাস—তোমায় একটু চা করে খাওয়াব।" বর্তমান লেখক বলিলেন, "আরে কি কর, জ্বরে কাঁপছো, পা টলছে, পড়ে যাবে যে, চা না হয় উনুন ধরলে হবে।" শরৎমহারাজের মনে কি এক ভাব উঠেছে, তিনিই জানেন; চা খাওয়াবার জন্য পুনঃপুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন, "না ভাই, তোমায় একটু চা করে খাওয়াব, আমার প্রাণ কেমন করছে, আমার বড্ড ইচ্ছা হচ্ছে তোমায় একটু চা করে খাওয়াব।" তিনি এমন ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন যে, সেখানে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করা চলে না। অগত্যা বর্তমান লেখক নির্বাক হইয়া রহিলেন। শীতের বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, শরৎমহারাজের সারাদিন জ্বরে ভুগে হাত পা কাঁপছে, সন্ধ্যার সময় অন্ধকার, তবুও তিনি উঠিয়া দেওয়াল ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন ও একটা কেরোসিন তেলের ডিবে যোগাড় করে আলো জ্বালিলেন। ঘুঁটে কয়লা যোগাড় করে রান্নাঘরের উনুনটা জ্বালিলেন। তিনি নিজেই সব করিলেন, বর্তমান লেখককে কোন কিছু করিতে দিলেন না। আগুনটা জ্বললে একটা বড় কেট্‌লি করে জল চাপিয়ে দিলেন। পরে জলটা যখন খুব ফুটিয়াছে তখন সেই কেট্‌লিটা ডান হাতে লইয়া পুনরায় সেই সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া জ্বর গায়ে টলতে টলতে ফিরিতে লাগিলেন। দেওয়ালটা ডান হাতের দিকে পড়িয়াছিল, আর ডান হাতে গরম জলের কেট্‌লি, অগত্যা বাঁ হাতে দেওয়াল ধরিয়া এক পা এক পা করিয়া চলিয়া বাহিরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় আসিলেন। বর্তমান লেখক অতি কারতভাবে তাঁহার ডান হাত হইতে কেট্‌লিটি লইবার চেষ্টা করিলেন, কারণ তিনি অতিকষ্টে আসিতেছিলেন। শরৎমহারাজ অতি করুণস্বরে ও কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "না

ভাই, তুমি কেট্‌লি নিও না ভাই, আমি তোমায় নিজে হাতে চা করে খাওয়াব ভাই।" জোর করিয়া লইতে গেলে পাছে গরম জল গায়ে পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় বর্তমান লেখক পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেট্‌লিতে হাত দিলেন না। শরৎমহারাজ উত্তর দিকে বড় হল ঘরটিতে গিয়া একটি সিঁড়ির নীচে ছোট কুট্‌রীর মত স্থান হইতে দুটো চায়ের বাটি ও একটা কাল রংয়ের চায়ের পাত্র (tea pot) আনিলেন এবং সেই পাত্রে চা দিয়া গরম জল ঢালিলেন। চা তৈয়ারি হলে বাটিতে ঢালিয়া কি এক শান্তিপূর্ণ অনির্বচনীয় মুখের ভাব করিয়া বর্তমান লেখককে খাওয়াইলেন। অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও বর্তমান লেখককে নিজে চা ঢালিয়া খাওয়াইয়া পরে নিজের বাটিতে চা ঢালিয়া খাইলেন। শরৎমহারাজের সেদিন কি একটা ভাব এসেছিল তাহা বলা যায় না। সেদিন যেন তিনি দেবভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। কথাবার্তা, চোখ মুখের ভাব, গলার স্বর, ভাব-ভঙ্গি সমস্তই যেন একটা উচ্চ অবস্থার চিহ্ন জ্ঞাপন করিতেছিল।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও যোগানন্দস্বামী—গরম কাল—একদিন বৈকাল বেলা যোগেন মহারাজের সহিত বর্তমান লেখক গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে গেলেন। যোগেন মহারাজ সদর ঘরের উপরে যে দুটি দরজা আছে, পশ্চিম দিকের দরজার মধ্যস্থলের দেওয়ালেতে ঠেস্ দিয়া বসিলেন। গিরিশবাবু ঘরের মাঝখানটিতে বসিলেন এবং বর্তমান লেখক দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের কাছে ঠেস্ দিয়া ঠিক যোগেনমহারাজের সম্মুখে বসিলেন। ঘরে বোধ হয় আরও কেহ কেহ ছিল, কিন্তু অনেক দিনের কথা, ঠিক নাম স্মরণ হচ্ছে না, সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছিলেন, কারণ তিনি তখন গিরিশবাবুর কাছে কাজ করিতেন। সেইসময় থিয়েটারে মামলামকদ্দমা চলিতেছিল, বোধ হয় কোন সুখবর হইয়াছে তাই গিরিশবাবু সেদিন বেশ প্রফুল্ল ছিলেন। গিরিশবাবুর পাতলা অল্প অল্প দাড়ি, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথেকাটা ও গা খালি ছিল। গিরিশবাবু মুখভঙ্গি করিয়া যোগেনমহারাজকে বলিলেন, "হ্যাঁরে যোগে,

তো শালার মনে আছে, সে দিন কি করে বাতি নিয়ে গিয়েছিলি ?” যোগেন মহারাজ হাস্য করিয়া বলিলেন, “দুঃ শালা, সেদিন আমার কি বিপদই গেল, তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) কিনা এক পাড় মাতালের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন।” গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আরে যোগে, বল দেখিনি তারপর কি হয়েছিল, সব ব্যাপারটা বলত একবার।” যোগেনমহারাজ বলিতে সুরু করিলেন, “একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরের বাতি ফুরিয়ে গেছল, আমাকে বললেন, ‘যা গিরিশের কাছ থেকে একটা বাতি নিয়ে আয়, আর গিরিশের সঙ্গে দেখা করে আয়।’ আমি তখন কে গিরিশ কিছুই জানিনে, শুনেছি গিরিশ নামে থিয়েটার-ওয়ালা একটা পাঁড় মাতাল আছে। আমি ত বাড়ি খুঁজে খুঁজে এইখানে এসে বসলুম। ছেলেমানুষ অতশত বুঝি সুঝিনি।” গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন “তারপর কি হল যোগে বলত।” যোগেন-মহারাজ বলিলেন, “দুঃ শালা, তখন তুই ত মাতাল হয়েছিলি—আমার কেবল ভয় হতে লাগলো পাছে তুই আমায় কামড়ে দিস; আর মনে মনে করছি বাতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না, দু-পয়সা না হয় তিন পয়সা দাম হবে। একটা বাতির জন্য এক রাজ্যি থেকে আর এক রাজ্যি আসা আর এই শালা পাঁড় মাতালের সামনে আসা।” পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া গিরিশবাবু আরও হাসিয়া বলিলেন, “যোগেন, আরও কি হয়েছিল বল দেখি, একবার শুনি।” যোগেনমহারাজ বলিতে লাগিলেন, আরে আমি ছেলেমানুষ, আমার তখন অল্প বয়স, আমি ঘরের ঐখানটাতে বসে রইলুম, তুই শালা তখন চুর মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তেই ঘরে ঢুকলি, তোর সেই চেহারা দেখেই ত আমার আক্কেল গুড়ুম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলি, কোত্থেকে এসেছ ? আমি বললুম, ‘দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই একটা বাতির জন্য আপনার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।’ তুই বললি, ‘একটা কেন একটা প্যাকেট নিয়ে যাও।’ তারপর থ্যাবড়ানি মেরে ঘরের মধ্যিখানে বসলি। শালা তখন মাল টেনেছিলি কিনা, তোর মুখে যা আসতে লাগলো

তাই বলে তাঁকে গাল পাড়তে লাগলি। আর মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে মনে মনে কি ভেবে মেজেতে টিপ টিপ করে তিনটি গড় করতে লাগলি। আবার গাল সুরু করলি; মুখের ত কোন আঁট ছিল না। আবার দক্ষিণেশ্বরের দিকে চেয়ে কি ভেবে আবার মেজেতে গড় করতে সুরু করলি। আমি যত উঠে পালাতে চাই, তুই শালা তত আমাকে বসিয়ে রাখিস। পালাতেও দিবিনি, আর বাতিও দিবিনি। তারপর সন্ধ্যার পর এক বাণ্ডিল বাতি আনিয়ে দিলি। আমি তো বাতি নিয়ে একেবারে চোঁ চাঁ দৌড়। দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে বাতিটি দিয়ে বললুম, 'কোথায় পাঠিয়েছিলেন আমায় একটা বাতির জন্য! কোথায় পাঠিয়েছিলেন মশায়, একটা ত্রিপুণ্ড্র মাতাল, খালি গাল, খেউড় আওড়াতে লাগলো।' তিনি বললেন, 'হাঁরে গাল ত দিয়েছিল, আর কি করেছিল বল দেখিনি।' তখন আমি বললুম, 'মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে কি বলতে লাগলো আর মেজেতে টিপ টিপ করে তিনটি গড় করলে।' তিনি আমার প্রতি একটু রাগ করে বললেন, তুই শালা কেবল গালটা দেখলি, ভালটা দেখলিনি, কি ভক্তি, কি টান? ওরা এক থাকের ভক্ত, খুব উঁচুদরের ভক্ত, তবে পথটা অন্য। আমি মনে মনে বললুম—ভক্ত হয় হোকগে, ও শালা মাতালের কাছে আর আমি যাব না।

গিরিশবাবু শুনিয়া আনন্দে টবুটবু হইয়া উঠিলেন। আর যেন আনন্দ রাখতে পারলেন না। গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন, "দেখ্ যোগে, সেদিন ভূনির (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসু) ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ। গিয়ে ত খেতে বসলুম। জ্ঞাত-ভোজন খুব ভাল খাইয়েছিল। তারপর বুঝলি কিনা খুব মাল টেনেছিলুম। কাচা কোঁচা খুলে গেছে আর কাপড়ও ময়লা করে ফেলেছি, এসেই তোকে দেখি। তিনি যে একটা বাতির জন্য আমার কাছে তোকে পাঠিয়েছেন, এই কথায় আমার একটা কি আহ্লাদ হল যে, সে আর বুকে চেপে রাখতে পারলুম না। আমি ভাবতে লাগলুম আমার উপর এত দয়া যে

সামান্য একটা বাতির জন্য আমার কাছে তিনি লোক পাঠিয়েছেন; আমার কি সৌভাগ্য! এই পাঁচ কথা ভেবে আমার এমন আহ্লাদ হল যে, সব ভুলে গেছলুম, তার উপর রং-এ ছিলুম, কি করে আহ্লাদ প্রকাশ করব কিছু খুঁজে না পেয়ে যা মুখে এসেছে তাই বলেছি আর একটা করে প্রণাম করেছি। সেদিন এমন আহ্লাদ হয়েছিল যে বহুদিন সে রকম আহ্লাদ আমার জীবনে হয়নি। সেদিন আমার ঠিক বিশ্বাস হল যে, তিনি আমায় নিশ্চয় কৃপা করেছেন ও গ্রহণ করেছেন।"

সে সময় রাস্তায় তত বাড়ি হয় নাই, তাই গিরিশবাবুর বৈঠকখানা থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির স্পষ্ট দেখা যাইত। গিরিশবাবু তাই মন্দিরটির দিকে দৃষ্টি করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন এবং যখন এই কথা হইতেছিল তখন গিরিশবাবু মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে মন্দিরের দিকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই উপখ্যানটি হইতে গিরিশবাবুর কিরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল তাহা সেখানে যাহারা ছিল, সকলেই বুঝিতে পারিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিংহাসন ও পর্যঙ্কতৈয়ারি করা—বরাহনগরের মঠে সামান্যভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা হইত অর্থাৎ শয্যাদি বা সিংহাসন এমন বিশেষ কিছু ছিল না। আলমবাজারের মঠে নিরঞ্জন-মহারাজের খেয়াল হইল যে, ঠাকুরের সিংহাসন ও পর্যঙ্ক করাইবেন। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে যেখানে ছোট কালী মন্দিরটি আছে সেখানে একটি বৃদ্ধ ছুতোর বাস করিত। লোকটি উঁচুদরের কারিগর ছিল, কিন্তু বয়স বেশী হওয়ায় সর্বদা কাজ করিতে পারিত না। নিরঞ্জনমহারাজ অনুসন্ধান করিয়া সেই কারিগরটি স্থির করিলেন এবং প্রত্যহই তাহার ছোট দোকান ঘরটিতে গিয়া বসিতেন ও কাজ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। সুবোধমহারাজ নিরঞ্জনমহারাজের সহিত যাইতেন ও বর্তমান লেখকও গিয়াছিলেন। সেই কারিগরটি কয়েক মাস পরিশ্রম করিয়া ঐ সিংহাসনটি তৈয়ারি করেন। ঐরূপ উৎকৃষ্ট গড়নের সিংহাসন খুব

অল্প স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিরঞ্জনমহারাজ ঠাকুরের শয্যাদি ও পর্যঙ্ক ধীরে ধীরে করাইতে লাগিলেন।

একদিন ১১টা বা ১২টার সময় নিরঞ্জনমহারাজ বলরামবাবুর বাড়িতে বসিয়া সম্ভবতঃ একখানি dictionary দেখিতেছিলেন। তাহাতে চীনে বা জাপানি কাঁসরের বর্ণনা আছে। নিরঞ্জনমহারাজের জাপানি কাঁসর কিনিতে বড়ই ইচ্ছা হইল এবং মাষ্টারমহাশয়ের কাছ থেকে কয়েকটি টাকা লইয়া একখানি কাঁসর ও চামড়ার গুলো দেওয়া বাজাইবার একটি ডাণ্ডা আনিলেন। সেই কাঁসরটি অদ্যাপিও ঠাকুর ঘরে বাজিয়া থাকে। এইরূপে ঠাকুর ঘরের অনেক জিনিস নিরঞ্জন-মহারাজ যোগাড় করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জনমহারাজের পরামাণিকের ঘাটে বেলগাছ রোপণ ও স্থানটি মার্বেল পাথর দিয়া বাঁধান—পরামাণিকের ঘাটে যেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অগ্নিসংস্কার করা হইয়াছিল, নিরঞ্জনমহারাজ সেইখানে একটা বেলগাছ রোপন করিয়াছিলেন এবং স্থানটি মারবেল পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আরও ইচ্ছা ছিল যে, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে যে যে স্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে তিনি তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া পাথর বসাইয়া দিবেন, কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা পূরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সকল দিকে বড় ইচ্ছা ছিল। এই রকম প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস তিনি তৈয়ারি করাইয়াছিলেন।

দীনমহারাজ—সম্ভবতঃ ১৮৯১ সালে গরমের শেষ ও বর্ষার প্রারম্ভে দীনমহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ) আলমবাজার মঠে প্রথম আসিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইবে। তিনি পদব্রজে গঙ্গা পরিক্রমা করিয়া আলমবাজার মঠে আসিলেন। অতি কঠোরী ও ত্যাগী ছিলেন, একটি পয়সা পর্যন্ত রাখিতেন না এবং অতিরিক্ত বস্ত্রও কিছু সঙ্গে রাখিতেন না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষটা বা উত্তরাখণ্ড বা হিমালয় প্রদেশ পদব্রজে পর্যটন করিয়াছিলেন। দেখিতে কৃশ ও

দীর্ঘাকৃতি এবং কার্যে সর্বদা তৎপর। পূর্বে তিনি কাশীধামে সোনারপুরায় বংশী দত্তের বাড়িতে অদ্বৈতানন্দ বা গোপালদাদার কাছে অল্প দিন ছিলেন। সেই সময় যোগেন মহারাজ, তুলসীমহারাজ প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল এবং তাঁহারা নিজেদের লোক করিয়া লইয়াছিলেন। পরে যখন তিনি আলমবাজারের মঠে আসিলেন, অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং আপনার লোক বলিয়া অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দমহারাজ আমেরিকা থেকে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে তিনি বাড়ি তৈয়ারির কন্ট্রাক্টারী কাজ করিতেন এবং উড়িষ্যা দেশের অনেক বাড়ি তিনি তৈয়ারি করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠ ও কাশী সেবাশ্রমের অনেক অংশ ইঁহার তত্ত্বাবধানে তৈয়ারি হইয়াছিল। তিনি কার্যেতেও যেমন নিপুণ ছিলেন সেইরূপ সাধনমার্গেও উন্নত। সাধন মার্গের কথা বর্তমান লেখকের সহিত রাত্রিতে কহিবার সময় তিনি এত উচ্চস্তরের কথা কহিতেন যে, শ্রোতারা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহাকে কথা বন্ধ করিতে বলিতেন। তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সকলের শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য।

স্বামী সারদানন্দের বিষাদের ভাব—আলমবাজারের মঠের প্রথম সময়েই একদিন গরমকালের বৈকালে শরৎমহারাজ বলিলেন—তিনি কিছু আহার করিবেন না; রাত্রিটা উপোস করিয়া থাকিবেন। বাহিরের দিকের বড় ঘরের সামনের বারান্দাটায় একখানা মাদুর পাতিয়া তিনি পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইলেন। বর্তমান লেখককে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহাকে সেই বালিসের অপর পার্শ্বে মাথা দিয়া পূর্বদিকে পা করিয়া শুইতে বলিলেন। গরমকাল একটু একটু হাওয়া চলিতেছে; বর্তমান লেখকের আধা নিদ্রা হইয়াছে, রাত্রিটা তখন একটু অন্ধকার ছিল। রাত্রি ১১টা বা ১১৷৷০টার সময় শরৎমহারাজ পশ্চিম দিকের দেওয়ালের জানালার দিকে মুখ করিয়া উঠিয়া বসিলেন

এবং অনেকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাত্রি বাড়িতে লাগিল। চাঁদ উঠিল, চাঁদের আলো মুখে ও বুকে পড়িল। নিকটস্থ শায়িত ব্যক্তির আর নিদ্রা হইল না, তিনি নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিলেন। শরৎমহারাজ প্রথমে গুণগুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন,—

"যাবে কিহে দিন আমার বিফলে চলিয়ে
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।" ইত্যাদি

প্রথম অতিমৃদুস্বরে তিনি এই গানটি গাহিতে লাগিলেন, ক্রমেই স্বর বাড়িতে লাগিল এবং শেষে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, অনবরত তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, মোটা মানুষ—বুক ভাসিয়া গিয়া পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইল। চাঁদের আলো পড়ায় তাঁহার অশ্রুপ্রবাহ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। এমন সকরুণ স্বরে কাতরপ্রাণে চারিটি পংক্তি গাহিতে লাগিলেন যে, শায়িত শ্রোতার বুকের ভিতর কষ্ট হইতে লাগিল। তখন শরৎমহারাজ ভাবে বিভোর হইয়া গিয়াছেন; দিক্‌বিদিক্ কিছুই জ্ঞান নাই, ভজনের অপর কলিগুলা তিনি গাহিতে পারিতেছেন না। কেবল চারটি পংক্তি অনবরত উচ্চারণ করিতেছেন ও হৃদয়বিদারক কাতরস্বরে যেন ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্তুতি করিতেছেন। এই সময় শরৎমহারাজের বড় একটা বিষাদের ভাব আসিয়াছিল। তিনি সকল কার্যে ও কথাবার্তাতে সর্বদাই "আর ত কিছু হল না, আর কিছুই পেলুম না, দেহটা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র," এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন।

কালী পূজার দিন রাত্রে সারদানন্দ স্বামীর রোদন—শরৎমহারাজের এইরূপ ভাব আরও দু'বার দেখা গিয়াছিল। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর প্রথম অমাবস্যায় যখন বেলুড় মঠে কালীপূজা হইয়াছিল তখন একবার এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শরৎমহারাজ রাত্রি ২টা বা ২৷৷০ টার সময় উপরকার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া অতি কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ রোদনের

পর তিনি নিজের মাথা মা কালীরচরণে সমর্পণ করিলেন। তিনি এমন করুণস্বরে ও কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে এক এক জনের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার মস্তক মা কালির পদে সমর্পণ করিতে-ছিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছিল। শরৎ-মহারাজের এরূপ ভাব দেখিয়া অন্য ঘরের অনেকেই উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি যাঁহাদিগের নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই শরৎমহারাজের খেদোক্তি অনুসারে আপনদিগের মস্তক মা কালীর কাছে মনে মনে পূর্ণাহুতি দিতে লাগিলেন। তাহার পর বৃদ্ধ নিত্যানন্দস্বামী উপরে আসিয়া শরৎমহারাজকে লইয়া চলিয়া যাইলেন। এইরূপ মাতোয়ারা ভাব, ধীর শান্ত শরৎমহারাজের পক্ষে আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সারদানন্দ স্বামীর বেলুড় মঠে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ও দরিদ্র-নারায়ণের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন—স্বামীজীর তিরোভাবের পর প্রথম বৎসর যে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হইয়াছিল, তাহাতে জনসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। প্রথমক্ষেপে সমস্ত মাঠটিতে লোক ভোজন করিতে বসিল; কিন্তু প্রায় তত পরিমাণ লোক খাইতে অবশিষ্ট রহিল। অভুক্ত লোকদিগের আহারের স্থান করিবার জন্য শরৎমহারাজ, বিরজানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক ঝাড়ু ও বালতি হাতে লইয়া মাঠ পরিষ্কার করিতে বাহির হইলেন। যদিও অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন, তবুও অপরকে আদেশ করা অবিধেয় বিবেচনা করায় ইহারা তিন জনেই কাজ সুরু করিলেন। বেলুড় মঠের দক্ষিণ দিকের মাঠের ধারে যে রকটি আছে তাহার অনতিদূরে একটি বাঁশের বেড়া আছে। উৎসবের দিন যদিও বাঁশের বেড়াটি খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু তৎস্থল হইতে কয়েক পদ দক্ষিণ দিকে গিয়া দরিদ্রনারায়ণদিগের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি বালতিতে তিন জনে ঢালিতে লাগিলেন। শাল পাতাতে ভাত, কড়ায়ের ডাল, মাছের ছ্যাঁচড়া, আলু দিয়ে মাছের দম এবং বোঁদে ও দই ইত্যাদি সব একত্রিত ও মিশাল হইয়া রহিয়াছে। দেখিতে অতি

বীভৎস হইয়াছিল। শরৎমহারাজ তিন জনের মধ্য হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন এবং ডান ধারের ও বাম ধারের উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি হইতে কিছু কিছু সর্বমিশ্রিত অন্ন উঠাইয়া লইলেন এবং বাম হাতের চেটোয় রাখিয়া ডান হাতের তিনটি অঙ্গুলি দিয়া অন্নগুলি মুখে দিয়া মাথায় হাত মুছিলেন এবং অতি ভক্তিপূর্ণ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উনসত্তিক জাতের প্রসাদ, মহাপ্রসাদ," বার তিনেক একথা বলিয়াই শরৎমহারাজ স্থির নিস্তব্ধ হইয়া র'হলেন। চক্ষুদ্বয় অর্ধ নিমীলিত, বাহুদ্বয় নিঃস্পন্দ, সমস্ত শরীর স্থির। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আবার কাজ করিতে লাগিলেন। শরৎমহারাজের মুখের ভাব দেখিয়া যেন বোধ হইতে লাগিল যে, তিনি যেন দেখিতেছেন গাছ, পাতা, ফুল, ঘাস, মানুষ, আকাশ, জল সবই যেন ব্রহ্মময়—সব একেরই বহুরূপ হইয়াছে! স-ব-ই একরূপ। কি স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব তাঁহার মুখে সে সময় হইয়াছিল তাহা বলিবার নয়। কয়েক দিবস পরে ঐ কথার উল্লেখ করায় শরৎমহারাজ অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ও সব কিছু নয়, ও সব কিছু নয়", এই বলিয়া তিনি কথা চাপা দিলেন ও আপনার ভাব গোপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় যেন তাঁহার চক্ষের ভিতর দিয়া আবার সেই ভাবটি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

স্বামী নির্মলানন্দ বা তুলসী মহারাজ—বরাহনগর মঠের শেষ বরাবর তুলসীমহারাজ যদিও হৃষিকেশ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষমহারাজকে পাগল অবস্থায় ফিরাইয়া লইয়া আসা অবধি বোধ হইতেছে যেন তিনি আর বিশেষ কোথাও বাহিরে যান নাই, মঠের সমস্ত দেখাশুনা কার্য তিনিই করিতেন। আলমবাজারের মঠ হইলে তুলসীমহারাজ একজন প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। যুবা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন। আলমবাজারের মঠে শশীমহারাজের সহকারীরূপে সমস্ত কার্যই করিতেন। ভিতর বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণের যে পায়খানাটি ছিল তাহা নিজেই মাঝে মাঝে পরিষ্কার করিতেন।

ঐ পায়খানার দরজার সম্মুখে একটা বা দুইটা মাটির গামলা থাকিত, একটা বড় মাটির কলসি বাঁ-কাঁধে ও একটা ডান হাতে করিয়া তিনি খিড়কির পুকুর হইতে জল আনিয়া গামলাগুলি ভরিয়া রাখিতেন। এইরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহার কাঁধে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মুখে একটি কথা কখনও ফোটে নাই বা বিরক্তির ভাব কখনও প্রকাশ পায় নাই। তিনি স্বয়ং বাজার করিয়া আনিতেন এবং যখন যে কাজের আবশ্যক হইত, তিনি তাহা প্রাণ দিয়া অকাতরে করিতেন। আবার একটু অবসর পাইলেই অধ্যয়ন করিতে বসিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধন ভজনও খুব করিতেন। সর্বদাই হাসি মুখ, মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। এই সময় তাঁহার সর্বোতোমুখী শক্তি বিকাশ পাইয়াছিল। সকলেই তখন তুলসীমহারাজের বিশেষ অনুগত হইয়াছিল। সকলকে তিনি এরূপভাবে সেবা ও পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন যে, সেটা যেন আজও আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সকলের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য অসীম ছিল।

বর্তমান লেখকের প্রতি নির্মলানন্দ স্বামীর ভালবাসা—উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠমাসে এক রবিবারে সকলে লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। স্নানের ঘাটে সকলে একত্রিত হইয়া কথাবার্তা বলায় বেলা অধিক হইয়া পড়ে। রাস্তায় তখন খোয়া ঢালা ছিল না, বালি ঢালা ছিল। সকলের শুধু-পা, রাস্তা গরম হইয়া পড়িয়াছিল। পায়ে সকলেরই তাত লাগিতে লাগিল। বাজার থেকে পূর্বদিকে খানিকটা আসিয়া বর্তমান লেখকের পায়ে ফোস্কা হইয়া উঠিল। তুলসীমহারাজেরও শুধু-পা ছিল, কিন্তু তিনি সহ্য করিয়া রহিলেন। অবশেষে ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া মঠে আসিলেন— নিজের কোন কষ্ট গ্রাহ্য করিলেন না। এইরূপ দয়া ও অপরের মঙ্গল কামনার উদাহরণ তাঁহার জীবনে অনেক আছে।

আর একটি উদাহরণ এই স্থানে বলা যাইতে পারে। তখন

জামাই ষষ্ঠীর দিন কয়েকবার সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জন্মোৎসব হইয়াছিল। বাহিরের কাহাকেও বলা হইত না,—কেবলমাত্র দুই একজনকে নিমন্ত্রণ করা হইত। তুলসীমহারাজ একদিন বৈকাল ৩টা বা ৩৷৹টার সময় ৭নং রামতনু বসুর গলির বাটিতে আসিয়া বর্তমান লেখককে আলমবাজারের মঠে যাইবার জন্য বলিয়া গেলেন, এবং আরও বলিলেন যে এ বিষয় অপর কাহাকেও বলিয়া যেন গোল না করে। রাত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভোগ দেওয়া হইলে তুলসীমহারাজ বর্তমান লেখককে নিজের কাছে বসাইয়া প্রসাদের অংশ হইতে তাহাকে খাওয়াইলেন, নিজে শুধু একটু জিভে ঠেকাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অমায়িক উদার ভাব যে শুধু বর্তমান লেখকের প্রতি ছিল তাহা নহে, সকলের সহিতই তাঁহার বিশেষ স্নেহপূর্ণ সদাশয় ভাব ছিল।

নির্মলানন্দ স্বামীর বিদ্যাচর্চা—বিদ্যাচর্চায় ও পাণ্ডিত্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাদি তিনি অনেক অধ্যয়ন করিয়া লইয়াছিলেন এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গলা ও হিন্দীর ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতে অনর্গল বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। নবাগত ব্যক্তিদিগকে বেদান্ত, ব্যাকরণ ও অপর শাস্ত্রাদি পাঠ করাইতেন এবং বক্তৃতাকালে ইংরাজী ভাষায় অনর্গল গভীর ভাবপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল যে, তিনি যেখানে বসিতেন বা শয়ন করিতেন সেই স্থানটি বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন।

রন্ধনকার্যে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। তিনি পাচকদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারিতেন। তাঁহার শক্তি বহুমুখী। তিনি সকলেরই শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য।

সদানন্দ স্বামীর পুনরায় মঠে আগমন—স্বামী সদানন্দ সিমলার বার্ড এণ্ড কোং-এর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সন্ন্যাসী বেশে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। সর্বদাই হাসি মুখ ও বিশাল হৃদয়। সকলেরই সহিত তিনি বালকের ন্যায় কথাবার্তা কহিতেন এবং অল্পতেই পরিতুষ্ট

হইয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন। গুপ্তমহারাজ বর্তমান লেখককে প্রীতিপূর্বক 'চাচা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং দীন-মহারাজকে 'নানা' (মাতামহ) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কার্তিক মাস আরম্ভ হইয়াছে, একটু একটু শীত পড়িয়াছে। একদিন সকালবেলা গুপ্তমহারাজ বর্তমান লেখককে বলিলেন, "চাচা, আমায় বাইবেল পড়িয়া শুনাও ত।" বর্তমান লেখক একখানা বাইবেল লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গুপ্তমহারাজ একখানি গৈরিক চাদর লইয়া আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। বর্তমান লেখক তাহা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি যদি ঘুমাও, তাহলে আমি পড়ব না।" গুপ্ত-মহারাজ মুখের চাদরটি খুলিয়া স্মিত মুখে বলিলেন, "তুমি যা পড়ছো, আমি সব শুনেছি, ঐটাই আমি ধ্যান করছি। আমি যেন সামেরিয়া নারীর উপাখ্যান (Parable of Samaritan Woman) দিব্য চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যীশু যেন সেই পাতকোর চাতালের উপর চুপ করে বসে আছেন"—বলিতে তাঁহার দুই চক্ষের কোণে জলবিন্দু আসিল, তখন তিনি স্থির হইয়া গম্ভীর মুখ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে মুখ অন্য ভাবাপন্ন হইয়া গেল—তাঁহার প্রস্ফুটিত তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিটি অন্য এক অতি উচ্চস্তরে চলিয়া গেল। অগত্যা পড়া বন্ধ হইল, দু'জনাই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। কোন বাঙনিষ্পত্তি নাই। অবশেষে বর্তমান লেখক সহসা বলিয়া উঠিলেন ; "দেখ্ গুপ্ত তোর মুখটা ঠিক আমাদের মতন দেখতে, তুই যেন পূর্ব জন্মে আমাদের বংশে জন্মেছিলি। তবে এ জন্মে কোন কারণে বস্তির ঘরে জন্মেছিস, যেমন একটু বড় হলি, থাকতে পারলি নি, পালিয়ে নিজের আত্মীয়দের কাছে ছুটে এলি।" গুপ্ত-মহারাজের এই কথাটা এতদূর ধারণা হইয়াছিল যে, সর্বদাই তিনি সকলকে এই কথাটা বলিতেন।

সদানন্দ স্বামীর একটি টাকা পাইয়া আনন্দ ও বর্তমান লেখককে রন্ধন করিয়া খাওয়ান—একসময়ে গুপ্তমহারাজ একটা টাকা

পাইয়াছিলেন। টাকটা তাঁহার বিষম জঞ্জাল হইয়া উঠিয়াছিল। টাকাটা লইয়া কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন যে, শনিবার চাচা আসিলে স্বহস্তে মাংস রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবেন। শনিবার তিনটার সময় বর্তমান লেখক উপস্থিত হইলে গুপ্তমহারাজ বালকের ন্যায় হাততালি দিয়া নৃত্য ও উল্লাসের ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। যেন কি একটা ব্যাপার হইয়াছে—আনন্দ তাঁর আর ধরে না। তুলসীমহারাজ (নির্মলানন্দ স্বামী) রহস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যারে গুপ্ত, তুই না ত্যাগী, তোর পক্ষে টাকাটা ছোঁয়া ঠিক না, তুই টাকাটা আমায় দে।" গুপ্তমহারাজের বালকের ন্যায় স্বভাব, হাস্য ও অর্ধনৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, "নেহি দেগা, কিসিকো নেহি দেগা।" তুলসীমহারাজও তাঁহাকে লইয়া এরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। একটা সামান্য কথা উপলক্ষ করিয়া সকলেই আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরে গুপ্তমহারাজ নিজে মাংস আনিলেন ও রান্নাঘরের পূর্বদিকের দালানে একটা বড় মাটির উনুন পড়িয়াছিল, আর একটা বড় লোহার স্টু-প্যান (stew-pan) ছিল। তিনি সেই উনুনটিতে মাংস রন্ধন করিলেন। সেইদিনকার রান্না এত সুস্বাদু হইয়াছিল যে বর্তমান লেখকের অদ্যাপি তাহা স্মরণ রহিয়াছে। বাগবাজারের বোস পাড়ার বাটিতে গুপ্তমহারাজ দেহত্যাগ করিবার মাস খানেক পূর্বে একদিন বলিলেন, "চাচা আলমবাজারের মঠে সেই মাংস রান্না হয়েছিল মনে আছে?" বর্তমান লেখক বলিলেন, "সেদিনকার কথা কি ভোলা যায়, সেটা অমৃতময়, ডেলা ডেলা ভালবাসা।" কথাটা শুনিয়া গুপ্তমহারাজের পূর্বস্মৃতি জাগরূক হওয়ায় তাঁহার চক্ষে একটু জল আসিল এবং ঠোঁট দুটি হাসি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সদানন্দ স্বামীর বর্তমান লেখকের প্রতি ভালবাসা—গিরিশবাবু গাড়ি করিয়া ফিরিবেন। তাঁহার সহিত আসিলে বাগবাজার পর্যন্ত

আসিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু হঠাৎ বর্তমান লেখকের তীব্র ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন ঠাকুরের কোন বৈকালী প্রসাদও ছিল না। তিনি গুপ্তমহারাজকে চুপি চুপি বলিলেন, "গুপ্ত, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমি অস্থির হয়ে উঠেছি, কিছু থাকে ত আমায় খেতে দাও।" গুপ্ত-মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এই যে এখুনি এনে দিচ্ছি বলিয়া উঠিয়া গেলেন। গিরিশবাবুর গাড়ি আসিয়াছে—তিনি ফিরিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন—গাড়োয়ান চেঁচামেচি করিতেছে—সেদিকে গোলমাল। ভালবাসা এমনি জিনিস যে, সব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে। গুপ্তমহারাজ গিরিশবাবুকে তাওয়া দেওয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিয়া একটি গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। গিরিশবাবু সেই প্রসঙ্গ লইয়া সকলের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। এদিকে গাড়োয়ানকে মিষ্টি কথা বলিয়া একটু বিলম্ব করিতে বলিলেন। দ্রুতপদে রান্নাঘরে গিয়া ঘুঁটে দিয়া আগুন করিলেন। ময়দাতে একটু গোলমরিচ ও লবণ দিয়া একটা লাড্ডু করিয়া একখানা 'টিক্কর' করিলেন এবং অল্পক্ষণের ভিতর একখানা গরম "টিক্কর" ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল লইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সামনের বড় ঘরে বসিয়া বলিলেন, "চাচা, এই গরম টিক্কর খাও—বহুৎ বড়িয়া মাল হুয়া হ্যায়।" বর্তমান লেখক তাঁহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন এবং পরে অল্প অল্প করিয়া গরম "টিক্কর ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন। ইহাকেই বলে ভালবাসা। যতদিন গুপ্তমহারাজের নাম থাকিবে ততদিন এই "টিক্কর ও ঠাণ্ডা জলের কথা জগতে থাকিবে।

আলমবাজারের মঠে তিনি নিবিষ্ট মনে বাইবেলখানি পড়িতেন এবং যীশু ও তাঁহার উপাখ্যানগুলি অতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া হৃদয়ে রাখিতেন। গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত ও শঙ্করের গ্রন্থাদি তিনি মন দিয়া শুনিয়া সারার্থ অতি সুন্দরভাবে গ্রহণ করিতেন এবং আবশ্যক হইলে অপরকে বুঝাইয়া দিতেন। যদিও পাণ্ডিত্য ও ভাষার পারিপাট্যে

তাহার নৈপুণ্য ছিল না কিন্তু তাঁহার বিশাল হৃদয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকায় গ্রন্থের সারার্থ অতি সুন্দরভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেন। জৌনপুরে জন্ম হওয়ায় তুলসীদাসের রামায়ণখানি তাঁহার বিশেষ আদরের ছিল। তাঁহার মেধাশক্তি বেশ ভাল ছিল; নিবিষ্ট মনে শুধু কথাবার্তা শুনিয়া অনেক গ্রন্থ না পড়িয়াও তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন। এই সময় গুপ্তমহারাজ অনবরত জপ করিতেন। যখনই একটু অবসর পাইতেন, তখনই দেখা যাইত যে তিনি স্থির হইয়া বসিয়া জপ করিতেছেন এবং ঠোঁট দু'খানি নড়িতেছে।

সদানন্দ স্বামীর জপ করা—তিনি যখন শেষ রোগাক্রান্ত হইয়া বাস পাড়ার বাড়িতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্বেও দেখা যাইত যে, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সদাসর্বদা জপ ধ্যান করিতেছেন। যে সমস্ত বালক তাঁহার সেবা করিত, তাহারা নিদ্রিত মনে করিয়া যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিত তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "একটু জপ কচ্ছি, তাহাতে তোমরা বাধা দেও কেন?" মৃত্যু সময়েও তাঁহার ঠোঁট নড়া এবং জপ করা দেখাগিয়াছিল।

প্লেগের সময় সদানন্দ স্বামী সেবাকার্য করা—গুপ্তমহারাজ কর্মী ছিলেন। কর্মই তাঁহার সাধনা ছিল কলিকাতায় যেবার প্রথম প্লেগ হয়, সেই সময় গুপ্তমহারাজ, সিষ্টার নিবেদিতা ও কতিপয় ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবার প্রয়াস করেন। তাঁহার পর তিনি ভাগলপুরের প্লেগে, স্বগোষ্ঠী লইয়া প্লেগ নিবারণের জন্য ভাগলপুর গিয়া তথায় এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে লোকের সেবা করিয়াছিলেন যে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্য দুঃস্থ গ্রামবাসীদিগের সাহায্য করা। গুপ্তমহারাজ, শরৎমহারাজের আদেশপ্রণোদিত হইয়া প্রথম এই কার্য শুরু করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্থানে যে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা হয়, এই কার্যের প্রবর্তক ছিলেন গুপ্তমহারাজ। দ্বিতীয়বার ভাগলপুর হইতে প্লেগ

নিবারণ কার্য সমাপনপূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া গুপ্তমহারাজের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি শয্যাশায়ী হইলেন এবং পুনরায় আর উঠিতে পারিলেন না, বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাহাতেই কয়েক বৎসর পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

এস্থলে গুপ্তমহারাজের বিস্তৃত জীবনী লেখা উদ্দেশ্য নয়। কেবল সংক্ষিপ্তভাবে গুটিকয়েক কথা উল্লেখ করা হইল মাত্র। এইজন্য তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা পরিত্যক্ত হইল। শুধু এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, গুপ্তমহারাজ স্বামীজীর সেবা করিবার জন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "আমি স্বামীজীর সেবা করিবার জন্য জন্মেছি, স্বামীজী চলে গেছেন, আমার দেহ রাখবার আর আবশ্যক নাই।"

সদানন্দ স্বামীর নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা—অনেক সময় তিনি বলিতেন, "আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে পারি নাই; তিনি বড়লোক, যশস্বী, শক্তিমান ও পণ্ডিত লোক—আমার সে লোককে ভয় করে। আমি বুঝি আমার পুরানো গরীব নরেন্দ্র দত্ত, যে শুধুপায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াত, আর দুজনে মিলে গাছের তলায় শুয়ে থাকতুম, আর যেদিন যা জুটতো, তাই খেতুম। আমার নরেন্দ্রনাথকে মিষ্টি লাগে—বিবেকানন্দকে ভয় করে।" এই উক্তি হইতেই গুপ্তমহারাজের সমস্ত জীবনের কর্ম বোঝা যায়। তিনি লোককে ভালবাসিতেন, কথাবার্তার দিকে তাঁহার তত খেয়াল ছিল না। এমন উদার ভাবের লোক জগতে ভবিষ্যতে আদর্শ হইয়া থাকিবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—বরাহনগরের মঠে যেরূপ, আলমবাজারের মঠেও সেইরূপ শশীমহারাজ পূজাদি করিতেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী ও তেজস্বী বলিয়া সকল কার্যে প্রধান হইয়াছিলেন। বস্তুত তিনি এক প্রকার কর্তা ছিলেন এবং তাঁহার আদেশমত সকলেই চলিতেন। মঠসংক্রান্ত যাহা কিছু কার্য সমস্তই শশীমহারাজ করিতেন ও তাঁহার আদেশমত সম্পাদিত হইত। তিনি যেমন অকাতর পরিশ্রমে সমস্ত কার্য করিতেন, তেমনি জপ, ধ্যান ও অধ্যয়ন করিতেন। বি. এ. পরীক্ষ

দিবার কয়েক দিবস পূর্বে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিয়াছিলেন। সংস্কার এমন জিনিস যে, আলমবাজারের মঠে তিনি একদিন হাস্য করিয়া বলিতেছেন, "আরে দেখ কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যে, পরীক্ষার চারদিন মাত্র আর বাকী আছে, আমি খুব মন দিয়ে পড়ছি আর ভাবছি কি করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। আর দেখ, কত বৎসর হল বাড়ি ঘর ত্যাগ করেছি, তবুও এখন পরীক্ষার ভয় ভেতরে রয়েছে; স্বপ্নেও তাই দেখছি, একেই বলে সংস্কার।"

গণিতবিদ্যা তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত। আলমবাজারের মঠে অনেক সময় ১১টার পর অবসর পাইলে তিনি গণিতের একখানা পুস্তক খুলিয়া শ্লেট বা কাগজে অঙ্ক কষিতেন। অনেক সময় অপরাহ্ন ৪টার পর অর্থাৎ ঠাকুরঘরের বৈকালী সমাপনের পর তিনি ভাগবৎখানি খুলিয়া ঋষভদেবের উপাখ্যানটি পড়িতেন এবং পড়িতে পড়িতে সহসা উত্তেজিত হইয়া বর্তমান লেখককে বলিতেন, "দেখ, একেই বলে উচ্চ অবস্থা। এই হচ্চে ঠিক পরমহংসের অবস্থা।" তিনি ঋষভদেবের উপাখ্যানটি অনেকবার পড়িয়াছিলেন ও বর্তমান লেখককে শুনাইয়াছিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও বর্তমান লেখক—একবার নিরঞ্জনমহারাজ বর্তমান লেখকের সহিত নানা গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা উঠিল। বর্তমান লেখক তখন বৈষ্ণব-গ্রন্থের কিছুই জানিতেন না—চৈতন্যদেবের শুধু নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন কাজেই বেফাঁস কথা কহিতে লাগিলেন। শশীমহারাজ অপর স্থানে ছিলেন। তিনি সেখান হইতে আসিয়া বলিলেন, "তুই ছোঁড়া বৈষ্ণব বই পড়েছিস্?" বর্তমান লেখক বলিলেন, "না।" আগে বৈষ্ণব বই পড় তবে তর্ক করবি—এই বলিয়া শশীমহারাজ চৈতন্যচরিতামৃত ও অপর অপর বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতে উপদেশ দিলেন। বর্তমান লেখক পুস্তকগুলি লইয়া আসিয়া চৈতন্যচরিতামৃতের ধারে ধারে দাগ দিয়া সমস্ত পুস্তকগুলি পড়িলেন ও যতদিন না অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল ততদিন

শশীমহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। তারপর গ্রন্থাদি লইয়া শশীমহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এইত সব বইগুলো পড়া হয়ে গেছে, এখন কি তর্ক করবে বল।" শশীমহারাজ বইগুলো খুলে দেখেন যে যথার্থই ধারে ধারে দাগ দেওয়া হইয়াছে। তিনি তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যা ছোঁড়া, সন্তুষ্ট হয়েছি"—এই বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। গল্পটি সামান্য হইলেও শশীমহারাজের বিদ্যাচর্চার দিকে কেমন অনুরাগ ছিল এবং অপরকেও তিনি কি করে বিদ্যাচর্চায় প্রণোদিত করিতে পারিতেন, ইহাই তাহার একটি উদাহরণ। মিষ্ট মধুরভাবে হাসি তামাসার ছলে তিনি অপরকে বিদ্যাচর্চায় উত্তেজিত করিতে পারিতেন।

বর্তমান লেখককে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভৎর্সনা—একদিন গরমকালে অপরাহ্ণে বর্তমান লেখক একখানি খৃষ্টীয় গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং শিবানন্দমহারাজের সহিত সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। উভয়েই বাহিরবাড়ির বড় ঘরটির মাঝের দরজার সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া কথাবর্তা কহিতেছেন; তাহাতে যীশু, বুদ্ধ ও মহম্মদের জীবনী লেখা ছিল এবং কে কাহার অপেক্ষা কতখানি বড়, তাহার যেন সব জরিপ করা হইয়াছিল। বর্তমান লেখকের অল্প বয়স, সেই জন্য দোষ গুণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শিবানন্দমহারাজের সহিত কথাবার্তা হইতেছিল। শশীমহারাজ ঠাকুরঘরের বৈকালীর কাজ করিতেছিলেন এবং জানালা দিয়া সব শুনিতে পাইতেছিলেন। সহসা তিনি রুদ্রমূর্তি ধরিয়া সম্মুখে আসিলেন এবং অতি ক্রোধপূর্ণ স্বরে বর্তমান লেখককে বলিলেন, "কি বই পড়ছিসরে হতভাগা ছোঁড়া?" বর্তমান লেখক যাহা পাঠ করিতেছিলেন তাহা লইয়া শশীমহারাজের সহিত তর্ক করিবার প্রয়াস পাইলেন। শশীমহারাজ তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ডান পা তুলিয়া লাথি মারিবার মত করিয়া দাঁড়াইলেন। সে ভীষণ রুদ্রমূর্তি দেখিয়া বর্তমান লেখকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল—তর্ক ও বাক্‌বিন্যাস তিরোহিত হইয়া যাইল। তখন শশীমহারাজ শান্ত

হইয়া বলিলেন, "দ্যাখ, ওসব বই কখন পড়বিনি। যাঁহারা মহাপুরুষ, জগৎগুরু, যাঁহাদের পায়ের ধুলো নিলে লোক পবিত্র হয়ে যায়, তাঁহাদের আবার বিচার করা? আর কে কত বড় সেই নিয়ে আবার তর্ক করা? লিখবে কে? না একটা সামান্য লোক যে মহাপুরুষদের কণামাত্র সাধনা করে নাই।" তার কথা শুনিয়া ধারণা হইল, উচ্চ অবস্থার সাধক জগৎ-গুরুদের নিন্দা করা—এতে মহাপাপ হয়। কথাটি অতি সত্য। বর্তমান লেখক একেবারে লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে মহাপুরুষ-দিগের নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি মহাপুরুষদের লইয়া আর তর্ক করেন নাই এবং অপর কেহ করিতে আসিলে শশীমহারাজের উপাখ্যানটি তাহাকে বলেন। শশীমহারাজের ন্যায় মহাপুরুষের সামান্য কাজের ভিতর হইতেও এক প্রগাঢ় উপদেশ পাওয়া যায়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও সুরেশচন্দ্র মিত্র—বরাহনগরমঠের অবস্থানের শেষ ভাগে সম্ভবতঃ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বর্ষাকালে সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদরী রোগ হইল এবং তাহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সকলেই আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন, শুধু শশীমহারাজ বরাহনগর মঠ ছাড়িয়া আসেন নাই। সুরেশবাবুর শশীমহারাজকে দেখিবার বড় আকাঙ্ক্ষা হইল, এইজন্য শশীমহারাজ একেবারে যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া করিয়া সুরেশবাবুকে দেখিতে আসেন। ঘণ্টাখানেক থাকিয়া আবার মঠে ফিরিয়া যান। তাহার পর তিনি বড় একটা কলিকাতায় আসেন নাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ হইয়াছে এ কথা তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত আছেন। এইজন্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহী অবস্থায় যে সকল সেবা করিয়াছিলেন, শশীমহারাজ সাধ্যানুযায়ী ঠিক সেই সকল কার্য করিতেন। এরূপ প্রত্যক্ষ গুরুভক্তি সহসা দেখা যায় না। একদিন আলমবাজারের মঠে বড় গরম পড়িয়াছিল, শশীমহারাজ পশ্চিম-দক্ষিণ

কোণের ঘরে শুইয়া আছেন এবং নিজেকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও ত এই প্রকার গরম বোধ হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ঘরে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অবশিষ্ট রাত্র পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন। এরূপ আশ্চর্য গুরুসেবা জগতে অতি বিরল।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরুভক্তি—শশীমহারাজের তীর্থ পর্যটনের কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করাই তীর্থবাস ও তপস্যা মনে করিতেন। "জয় গুরুদেব শ্রীগুরুদেব" এই কথাটি উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিভোর হইয়া প্রদীপ্ত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে থাকিতেন। সব তীর্থই তাহার ঠাকুরঘর ছিল। জপ বিষয়ে তিনি একাগ্রমনা ছিলেন। বরহনগরমঠের প্রথম অবস্থায় তখন শশীমহারাজ অল্পবয়স্ক, তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "এই ঠাকুরের সেবা লইয়াই আমি জীবন কাটাব, আর আমার অন্য কিছুই আবশ্যক নাই।" যথার্থই তাহা তিনি নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অনবরত জপ করিতেন এবং সকলকেই জপ ধ্যান করিতে উপদেশ দিতেন। জপ ও গুরুসেবা এই দুইটি তাঁর প্রাণ ছিল।

বরাহনগরের মঠে যেরূপ অনটন হইয়াছিল, আলমবাজারের মঠে উৎসব উপলক্ষে সেইরূপ প্রচুর সামগ্রী আবার আসিতে লাগিল। এক একদিন মা অন্নপূর্ণা যেন দশ হাতে জিনিস দিতে লাগিলেন।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভক্তদের প্রতি ভালবাসা—কলিকাতার বাজারের উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া ভক্তেরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভোগাদি দিতে লাগিলেন। শশীমহারাজ সমাগত ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেন কিন্তু পরে অনেক জিনিস উদ্বৃত্ত থাকিত। তিনি উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সেই সকল উদ্বৃত্ত সামগ্রী প্রসাদ বলিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিতেন এবং যাঁহারা সম্মত হইতেন, তাঁহাদের সহিত জিনিস পাঠাইয়া দিতেন—ঘরে কিছুই রাখিতেন না।

বালকের ন্যায় সব সময়ে হাস্য মুখে কথা কহিতেন এবং বালকের

ন্যায় নানাপ্রকার রহস্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার কথাবার্তা ও হাস্য-কৌতুকের ভিতর একটা মাধুর্যপূর্ণ গম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার হাস্য-কৌতুকে অপরে হাস্য-কৌতুক করিতে সাহস করিত না। বালকত্ব করিলেও তিনি খুব রাসভারি লোক ছিলেন। তাঁহার একটি প্রিয় জিনিস ছিল—কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে বড় ভালবাসিতেন। একবার করিয়া মুড়ি মুখে দিতেছেন, আর একবার করিয়া কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিতেছেন, যখন দুই চক্ষে জল আসিত তখন তাঁর কাঁচা লঙ্কা খাওয়া সাব্যস্ত হইত। তিনি রুটি, লুচি খাইতে পছন্দ করিতেন না। ভাতই তাঁহার প্রিয় আহার ছিল এবং অধিক পরিমাণে খাইতে পারিতেন। 'উদ্বোধন' অফিসে যখন তাঁহার শেষ অসুস্থ অবস্থা, ডাক্তারেরা তাঁহাকে দেড় সের মাত্র দুধ খাওয়াইয়া রাখিয়াছিল। একদিন বর্তমান লেখক তাঁহাকে প্রাতে দর্শন করিতে যাইলে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখছ ভাই, শ্যালারা আমায় শুকিয়ে রাখছে, আমায় মাত্র দেড় সের করে দুধ দেয়। জানতো আমার সেই 'Royal morsel' (অর্থাৎ বড় থাবা করিয়া অন্নের গ্রাস) এই বলিয়া অঙ্গুলি বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার অন্নের গ্রাসের নির্দেশ করিয়া দিলেন। অগ্নি ও জল একসঙ্গে মিশাইলে যাহা হয়, শশীমহারাজ তাহাই ছিলেন। প্রত্যক্ষস্থানে গুরুসেবা করা কাহাকে বলে তাহাই তিনি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন। যৌবনের প্রথম অবস্থায় তিনি কৃশ ছিলেন এবং গায়ের রং ফ্যাকাসে সাদা ও মুখে কোঁকড়ানো দাড়িছিল কিন্তু শেষ অবস্থায় তিনি স্থূলকায় হইয়া গিয়াছিলেন।

স্বামী সুবোধানন্দ—স্বামী সুবোধানন্দ বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বরাহনগর মঠে রহিলেন। বরাহনগর মঠে যেমন তিনি আপন সাধন-ভজন লইয়া থাকিতেন সেইরূপ আলমবাজার মঠেও সাধন-ভজন লইয়া রহিলেন। কখনও বা তিনি অন্যস্থলেও থাকিতেন তাঁহার সকল বিষয় আমার বিশেষ স্মরণ নাই।

গঙ্গামায়ি ও স্বামী তুরিয়ানন্দ—হরিমহারাজ বরাহনগরের মঠে অল্পদিন থাকিয়া তীর্থপর্যটন ও সাধন-ভজনের জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বিচিত্র। একনিষ্ঠ সাধক এরূপ অল্পই আজকাল জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বরাহনগর মঠ হইতে বহির্গত হইয়া নানা তীর্থপর্যটন করিয়া কিছুদিন বৃন্দাবনে বাস করেন। বৃন্দাবন হইতে কুসুমসরোবর, গোবর্ধন প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন সাধন ভজন করিয়া এক সময়ে তিনি নন্দগ্রাম বর্ষানাতে অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্ষানায় অবস্থানকালে বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ির সহিত দেখা করিয়াছিলেন। হরিমহারাজ যখন বর্ষানাতে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি জীবিতা ছিলেন। গঙ্গামায়ির বয়স তখন অধিক হইয়াছিল এবং দু-একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সেবা করিত। গঙ্গামায়ি হরিমহাজের পরিচয় পাইয়া বিশেষ আদর করিতেন এবং আশীর্বাদ করিয়া বলিতেন, "তুমি যখন এরূপ মহাপুরুষের আশ্রয় ও আশীর্বাদ পাইয়াছ, তখন তোমার পথ খোলা রহিয়াছে।" গঙ্গামায়ি হরিমহারাজকে সর্বদা আশীর্বাদ ও অভয়বাণী দিতেন। হরিমহারাজও গঙ্গামায়িকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে হৃষিকেশ প্রভৃতি উত্তরাখণ্ড পর্যটন করিয়া মিরাটে আগমন করেন এবং তথায় সকল গুরু-ভাই একত্রিত হইয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়া পরে অন্য কয়েক জায়গায় ভ্রমণ করিয়া আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করেন।

তুরিয়ানন্দ স্বামীর পাণ্ডিত্য—হরিমহারাজ অতি ধীর এবং অল্পভাষী ; চাপল্য ও নিরর্থক বাক্যালাপ আদৌ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মেধা-শক্তি অতি প্রখর ছিল ; উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্র মুখস্থ বলিতে পারিতেন এবং শঙ্করাচার্য রচিত গ্রন্থাদি অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে তিনি একজন প্রধান অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি এমন সুললিত কণ্ঠস্বরে শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করিতেন যে সকলেই তাহা শুনিয়া মোহিত হইয়া যাইত। শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও তাঁহার বিশেষ আয়ত্ত ছিল। সাধক ও পণ্ডিত বলিয়া সর্বত্র

সমাদৃ হইতেন। বাঙ্গলা, ইংরাজী ও হিন্দি ভাষার গ্রন্থ হইতে তিনি ইচ্ছামত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারিতেন। বাঙ্গলা সাহিত্য খুব ভাল রকম জানিতেন এবং মেঘনাদবধ কাব্যখানি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অভিমানশূন্য মহাত্যাগী সাধক ছিলেন। আলমবাজার মঠে তিনি অতিশয় গম্ভীর এবং নিরবিচ্ছিন্ন জপ-পরায়ণ ছিলেন। আহারে বসিয়াছেন, অন্নাদি দিতে সামান্য বিলম্ব আছে—তখনও জপ করিতে-ছেন, কিন্তু সে ভাব তিনি বাহ্যতঃ প্রকাশ করিতেন না। তিনি মহাশক্তিমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা আত্মগোপন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু গম্ভীর বলিয়া যে হাস্য-কৌতুক জানিতেন না তাহা নহে, আবশ্যক হইলে তিনি এমন হাস্য-কৌতুক করিতে পারিতেন যে সকলে হাসিয়া লুটাপুটি খাইত, কিন্তু সেরূপ খুব অল্পই করিতেন। অধ্যয়ন ও জপ-ধ্যান এই দুটি তাঁহার জীবনের প্রধান জিনিস ছিল। সকলের সহিত তিনি সমভাবে মিশিতেন এবং কোন প্রকার নিজের প্রাধান্য রাখিতেন না। আলমবাজার মঠে একদিন তাঁহার পরিধেয় বহির্বাসখানি একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। সেই ছিন্ন বসনখানি তিনি পরিধান করিয়া থাকিতেন। ঘটনাক্রমে কেহই তাহা বিশেষ লক্ষ্য করে নাই। বর্তমান লেখক শশীমহারাজের নিকট তাঁহার ছিন্ন বসনের উল্লেখ করিলে সকলেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ নূতন বস্ত্র তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। হরিমহারাজ নির্লিপ্ত ও সর্বত্যাগী, তিনি স্নেহপূর্ণ মধুর বৈরাগ্যময় স্বরে বলিলেন, "কেন তুমি সামান্য কথা নিয়া সকলকে চঞ্চল করিলে? বহির্বাস ছিঁড়ে গেছে তাহাতে ক্ষতি কি? কৌপিন ত আছে—তাহাই যথেষ্ট।" কথাগুলি এমন নিরভিমান বৈরাগ্য-পূর্ণস্বরে বলিলেন যে তাঁহার ভিতরের নিভৃত ভাবগুলি যেন স্পষ্ট বোঝা গেল।

তুরিয়ানন্দ স্বামীর ত্যাগ—কথিত আছে, মানবের মন যখন উচ্চ অবস্থায় উঠে তখন জগতের প্রত্যেক বস্তুতে সাম্যভাব দেখে এবং ব্রহ্মশক্তি তখন কণ্ঠ দিয়া বাহির হইলে তাহাকে নাদ বা শব্দ-ব্রহ্ম বলে। ইহাই মহাপুরুষের ভিতরকার উন্নত অবস্থার একমাত্র পরিচায়ক।

হরিমহারাজের ভিতর এই সব শক্তি বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। বেলুড় মঠে একবার শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রায় দেড়শত লোক সমবেত হইয়াছিল। মিঃ ফ্রাঙ্ক সেই বৎসর আমেরিকা থেকে নূতন আসেন। রাত্রে শিবপূজার কালে সকলেই উল্লাসে "হর হর ব্যোম, হর হর ব্যোম" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল কিন্তু এত চীৎকারের মধ্যেও হরিমহারাজের কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল—যেন এ জাতীয় নয়, অন্য প্রকার শব্দতরঙ্গ চলিতেছে।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর নিরভিমান—হরিমহারাজ আমেরিকাতে কিছু বৎসর ছিলেন। তথায় বহু লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত এবং আপনাদিগকে তাঁহার আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিত। তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া আমেরিকাতে যে সব মহৎ কার্য করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রকার উল্লেখ বা গর্ব করিতেন না। তাঁহার কথাই ছিল, "ঠাকুর ঠাকুরের কার্য করিয়া থাকেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র।" তিনি অতি বালকভাবের এবং নিতান্ত অভিমানশূন্য লোক ছিলেন। রাস্তায় যখন তিনি একলা পায়চারি করিতেন তখন কখন কখন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে না জানিয়া ফরমাজ বা আদেশ করিত, তিনি নির্বিকার পুরুষ; শুনিবামাত্র আগন্তুক ব্যক্তির মনস্তুষ্টির জন্য তাহার কার্যটি তৎক্ষণাৎ করিয়া দিতেন। তাহার পর তাঁহার পরিচয় পাইলে লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছিল। ধর্ম জগতে উচ্চ চিন্তার অধিকারী যে কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হরি-মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

অভেদানন্দ স্বামীর স্তোত্র রচনা—কালীবেদান্তী বরাহনগর মঠ হইতে সাধন ভজন ও তীর্থ পর্যটন করিবার জন্য ৺কাশীধাম প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া হৃষিকেশে গমন করেন। পুনরায় তথা হইতে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া রাজপুতনা, দ্বারকা প্রভৃতি স্থান হইয়া আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন। আর কোন্ কোন্ স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন বর্তমান লেখক তাহা বিশেষ জানেন না। এই

সময় বোম্বাই প্রভৃতি স্থানও তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া কালীবেদান্তী নিজের স্বভাবসিদ্ধ অধ্যয়নাদিতে মন নিবিষ্ট করিলেন। তিনি ভিতরকার মাঝের কক্ষটিতে আপন পুস্তকাদি লইয়া পাঠ ও সাধন-ভজন করিতেন। ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র তিনি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। এই সময় তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করেন। সম্ভবতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এইটি প্রথম স্তোত্র। স্তোত্রটি অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং এখনও উহা অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। আলমবাজারের মঠে প্রাতে কেহ কেহ চা পান করিতেন। চা পানকালে অনেকে সমবেত হইয়া নানাশাস্ত্র বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেন। একটা প্রশ্ন উঠিলে সকলেই নানা গ্রন্থ উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেন এবং ইহাতে সকলের বিশেষ উপকার হইত। অনেক সারগর্ভ কথা এই সময় হইত, একটি প্রশ্ন উঠিলে যতদিন না তাহার মীমাংসা হয় ততদিন সকলে মিলিয়া আলোচনা করিতেন, তাহাতে নানা গ্রন্থ পাঠের কার্য হইত।

যদিও তর্ককালে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সকলেই দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, কিন্তু পরস্পর এরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া কথা কহিতেন যে তাহা এক আদর্শ শিক্ষাস্থল হইয়া উঠিত; অবজ্ঞার লেশমাত্র থাকিত না এবং সকলের মুখ থেকে নানা শাস্ত্রের কথা এক সময়ে পাওয়া যাইত। কালীবেদান্তী তর্কে বিশেষ পণ্ডিত ও নিপুণ লোক ছিলেন, এইজন্য তিনি বিশেষ করিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইতেন।

স্বামী অভেদানন্দ ও বর্তমান লেখক—একদিন তর্ক-বিতর্ক করিয়া সকলে লোচনঘোষের ঘাটের পার্শ্বে অশ্বত্থগাছওয়ালা কয়লাওয়ালাদের ঘাটে চলিলেন। অশ্বত্থগাছের তলায় বসিয়া কালীবেদন্তী ও বর্তমান লেখক ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থাগারের কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থাগারে অনেক গ্রন্থ ছিল

এবং সেগুলি তখন বাজারে বিক্রয় হইবে। কালীবেদান্তী বলিল, "যদি টাকা সংগ্রহ করা যাইত তাহা হইলে ঐ গ্রন্থাগারটা খরিদ করিবার চেষ্টা করা হইত।" বাবুরামমহারাজ শিশি করিয়া তেল কয়লা-ওয়ালাদের ঘরে রাখিতেন। তিনি শিশিটি বাহির করিয়া অপরদিকে বসিয়া তেল মাখিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে জলে নামিয়া ঝাঁপা-ঝাঁপি করিতে লাগিলেন। তখন ভাটা ছিল, গরমি কাল, সম্ভবতঃ রবিবার হইবে, কারণ সান্ন্যাল মহাশয়, অফিসে চাকরী করিতেন, তিনিও তখন উপস্থিত ছিলেন।

সান্ন্যাল মহাশয়ের বর্তমান লেখককে উৎসাহদান—সান্ন্যাল মহাশয় বর্তমান লেখককে বলিলেন, "অত করে জলে ঝাঁপা-ঝাঁপি করিসনি অসুখ করবে।" বর্তমান লেখক তাহা শুনিয়া ধীর হইয়া স্নান করিতে লাগিলেন। পার্শ্বে তুলসীমহারাজ সাঁতার কাটিতেছিলেন কিছুদূরে শরৎমহারাজ গামছাদিয়া গা ঘসিতেছিলেন এবং সকলের চাপল্য দেখে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় বর্তমান লেখককে বলিলেন, "দ্যাখ, আমরা মুখ্যু-সুখ্যু লোক, তুইতো খুব লেখাপড়া করিস্, তা-তা-তা-আমার একটা কথা শোন, তুই-তুই-তুই-এই এই-এই বরাহনগর ম-ম-মঠের স-ব বিষয়ের একটা কিছু লেখ দিকিনি, যা-যা হইয়াছে স-ব এক-একটা লিখে ফ্যাল দিকিনি।" সান্ন্যাল মহাশয় হর্ষিত বা উত্তেজিত হইয়া কথা কহিতে গেলে একটু তোতলা হইয়া পড়িতেন। সান্ন্যাল মহাশয় গঙ্গায় গা ঘসিতে ঘসিতে এমন মিষ্ট স্নেহপূর্ণ স্বরে আদেশ করিয়াছিলেন যে বর্তমান লেখক মনে মনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট এই আশীর্বাদ চাহিলেন, যদি সময় হয় তাহা হইলে যেন গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া সান্ন্যাল মহাশয় যাহা আদেশ করিতেছেন তাহা যেন পূর্ণ করিতে পারেন। বর্তমান লেখকের মনে এই আদেশটি চিরকাল স্মরণ ছিল। এই গ্রন্থ লিখিবার এইটিই হইল মূল কারণ। এইজন্য এইস্থানে তিনি সান্ন্যাল মহাশয়ের চরণে প্রণাম করেন ও এই আশীর্বাদ চান যে তাঁহার আদেশমত গ্রন্থখানি যেন সফল

হয়। স্নানান্তে সকলে বেলা প্রায় ১২টার সময় আলমবাজারের মঠে আসিয়া প্রসাদ পাইলেন।

অভেদানন্দ স্বামীর শরীর ফোলা—কালীবেদান্তী ও বর্তমান লেখক বাহিরের বড় ঘরের পশ্চিম দিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থিত স্থানটিতে একটা বালিশ মাথায় দিয়ে শয়ন করিলেন। বেলা ৩টার সময় হঠাৎ কালীবেদান্তীর হাত মুখ ফুলিয়া উঠিল। কালীবেদান্তী বর্তমান লেখককে বলিলেন, "ত্যাখ্ গা-টা ফুলে উঠল কেন?" ক্রমশঃ তাঁহার হাত, পা মুখ ও সমস্ত শরীরই ফুলিয়া উঠিল এবং শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না, শেষে সকলের এমন ভয় হইল যে, বুঝি বা শরীরের চামড়া ফাটিয়া যাইবে বা মাথার শির ছিঁড়িয়া যাইবে। সকলেই ভীত ত্রস্ত হইয়া উঠিল অবশেষে ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায় বরাহনগর হইতে আসিয়া আশুরক্ষা হয় এরূপ কোন ঔষধ দিয়া পীড়ার কারণ নির্ণয় করিতে লাগিলেন। যদিও শরীরের ফোলা দুদিন বাদে কমিয়া গেল, কিন্তু দিনকতক পরে পায়ের পাতার উপর একটা ফোস্কা উঠিল, পরে ফোস্কা ভিতর থেকে ছিঁড়িয়া গেলে একটি সাদা সরু চুলেরমত দেখা গেল। সেটিও ক্রমশঃ সরু সূতারমত হইল। টানিতে গিয়া ছিঁড়িয়া যাইল ডাক্তারেরা অনেক গ্রন্থাদি দেখিয়া স্থির করিলেন যে, ইহাকে tape worm বলে। অর্থাৎ সূতার মতন একরকম পোকা হইয়া সর্বশরীর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে কালীবেদান্তী আজমীর, পুষ্কর, রাজপুতনার অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই দেশের জল-দূষিত রোগ।

ডাক্তারেরা দুই তিনটি স্থানে অস্ত্রোপচার করিয়া কালীবেদন্তীর পীড়ার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, এবং দুইখানি পাতলা কাঠ উচ্চ করিয়া তাহার উপর নেয়ার বা ফিতা লম্বা করিয়া তাহার উপর পালকের গদী দিয়া রোগীর পা রাখিয়া দিলেন। কলিকাতার ডাক্তারেরা এ পীড়ার পূর্বে চিকিৎসা না করায় সকলেই ভীত

হইয়াছিলেন, পরে জানিতে পারা গেল যে এ রোগ রাজপুতনায় হইয়া থাকে, ইহাকে সচরাচর নেহারু রোগ বলে। বৃন্দাবনে ইহা অনেক দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার একমাত্র ঔষধ হইতেছে হিং খাওয়া ও ক্ষতস্থানে হিং লাগান।

অভেদানন্দ স্বামীকে সারদানন্দ স্বামীর শুশ্রূষা—পীড়াকালে শরৎমহারাজ কি আশ্চর্যরূপে প্রাণ দিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি অপরকে বলিতেন এই পীড়ার বীজ অন্যের গায়ে লাগিলে তাহারও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য তিনি ক্ষতস্থান ধোয়াইবার সময় অন্য কাহাকেও নিকটে যাইতে দিতেন না। শরৎমহারাজ নিজের প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া রোগীর সমস্ত কার্য করিতেন। এইরূপে প্রায় তিন মাস তিনি সেবা করিয়াছিলেন, তখন রোগীর চিকিৎসাই তাঁহার জপ, ধ্যান, সাধন-ভজন হইয়াছিল। কি স্নেহভাবে; কি যত্নে, কি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখাইয়া শরৎমহারাজ কালীবেদান্তীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন তাহা বলিবার কথা নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের যে সেবাভাব প্রচলিত হইয়াছে ইহা শরৎমহারাজ তাঁহার জীবনে তখন দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ শরৎমহারাজ পাহাড় থেকে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসা হইতে ১৮৯৬ সালে মার্চ মাসে ইউরোপ যাত্রা পর্যন্ত এই সময়টি যদিও সাধারণের অজানা, কিন্তু এই সময়েই শরৎমহারাজ যথার্থ সাধন-ভজন ও তপস্যা করিয়াছিলেন। সর্বদাই দেবভাবে তিনি পরিপূর্ণ থাকিতেন এবং মন উচ্চস্তরে থাকিত। ভালবাসা দিয়া আকর্ষণ শক্তি তাঁহার খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অনেকে শরৎমহারাজের নিকট থাকিতে, তাঁহার সাথে কথাবার্তা কহিতে বিশেষ ইচ্ছা করিতেন। সাধন ভজন সম্বন্ধে এই সময়টি তাঁহার জীবনে শ্রেষ্ঠ সময় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

অভেদানন্দ স্বামীকে সারদানন্দ স্বামীর হাঁটাইবার চেষ্টা—কালী-বেদান্তীর পা-টি সর্বদা প্রশস্ত করিয়া একভাবে রাখায় পায়ের মাংসপেশী সকল ক্ষীণ হইয়া গেল। যদিও পীড়া আরোগ্য হইল, কিন্তু চলিবার

ক্ষমতা রহিল না। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিল যে, যে কোন রকম উপায় করিয়া রোগীকে একটু করিয়া চলান আবশ্যক, তাহা না হইলে পা-খানি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। একদিন বৈকালে ৪ টার সময় শরৎ-মহারাজ কালীবেদান্তীকে খুব আদর করিয়া হাতে একটি লাঠি দিয়া ধরিয়া বাহিরের সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া নীচের উঠানে লইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ তাঁহার সাথে বসিয়া খুব আদর করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ শরৎমহারাজ উপরে দৌড়িয়া চলিয়া আসিয়া কালীবেদান্তীকে একলা উপরে আসিতে বলিলেন। কালীবেদান্তী নিজেকে অসমর্থ ও চলচ্ছক্তিহীন মনে করিয়া কাকুতি মিনতি ও রোদন করিতে লাগিলেন। শরৎমহারাজ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বড়ঘরের সামনের বারান্দা থেকে কালীবেদান্তীকে নির্মমভাবে অতি কঠোর বচনে গালি দিতে লাগিলেন। কালীবেদান্তী প্রথমে নীচে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাতে কেহ কর্ণপাত করিল না দেখিয়া অবশেষে ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়া অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সিঁড়ি দিয়া স্বয়ং উঠিয়া আসিলেন। শরৎমহারাজ, সান্ন্যালমশাই, তুলসীমহারাজ ও শশীমহারাজ সকলে তাহাতে হাসিতে লাগিলেন। শরৎমহারাজ তখন আবার স্নেহপূর্ণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, "কালু ভাই, রাগ করিস না, তোর ভালর জন্যেই করেছি, ডাক্তারেরা এইরূপ করিতে বলে গেছে ভাই, আমার কোন দোষ নাই।" তারপর থেকে কালীবেদান্তী লাঠি লইয়া নিজেই চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীকৃষ্ণ—ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে সর্বদা যাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং আদর করিয়া "ভবু" বলিতেন। দেখিতে রং উজ্জ্বল, মুখ গোল ও ঈষৎ চেপ্টা এবং মুখে কাল কাল কোঁকড়ান দাড়ি, তাঁহার সম্মুখের উপরকার দুটি দাঁত একটু বাঁকা ছিল, তাঁহার বাড়ি বরাহনগরে, অমায়িক ভক্তভাবের লোক। প্রচণ্ডভাব তাহার কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের

দেহত্যাগের পর ভবনাথের বরাহনগরের মঠে যাতায়াত অতি কম হইয়াছিল, তখন তিনি পুনরায় বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় বাদুড়বাগানের এক মেসে থাকিতেন। তাহার পর তিনি সরকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শক-এর কর্ম লইয়া অপর স্থানে গিয়াছিলেন। এইজন্য বরাহনগর মঠে আসিতে পারিতেন না, আলমবাজারের মঠে অবসর পাইলেই মাঝে মাঝে আসিতেন এবং পূর্বের ন্যায় আনন্দ করিয়া সকলের সহিত মিশিতেন।

কালীকৃষ্ণ নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু ছিলেন, বাড়ি বরাহনগর। তিনিও ভবনাথের সহিত মাঝে মাঝে আসিতেন ও আপনার লোকের ন্যায় সকলের সহিত মিশিতেন।

একদিন ভবনাথ বৈকালে আসিয়াছেন, কিন্তু পরেই যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে সেজন্য বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন। সকলে বলিল "উনুন ধরেছে, দুখানা রুটি খেয়ে যাওনা"। ভবনাথ রান্নাঘরের উত্তর দিকের দালানের কোণে অর্থাৎ ভিতরকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ডান দিকের দালানের প্রথম স্থানটিতে কালীকৃষ্ণর সঙ্গে বসিয়া একটু তরকারি দিয়া গরম রুটি এক এক খানা করিয়া মহানন্দে খাইতে লাগিলেন। দু-একখানা গরম রুটি খাইয়া ভবনাথের ভক্তিভাব একেবারে প্রবল হইয়া উঠিল তখন মেরুদণ্ড লম্বা করিয়া ধ্যান করার ভাবে বসিয়া ভক্তি গদগদ ভাবে বলিলেন, "Man cannot live on bread alone" অর্থাৎ যীশুর উক্ত কথাটি 'অন্নের উপরেই নির্ভর করিয়া কেবল মানুষের জীবন চলিতে পারে না।' কিন্তু বাইবেলের এই কথাটার অপর অংশ বলিবার পূর্বেই সম্মুখে দণ্ডায়মান কালীবেদান্তী হাস্যচ্ছলে বলিলেন, "But upon bread and mutton" অর্থাৎ 'রুটির সঙ্গে ভাল তরকারি হলে একরকম বেশ চলে।' এই আর কি সকলে ভবনাথকে লইয়া হাস্য ও আনন্দ করিতে লাগিল। ভবনাথের ভক্তিভাব যদিও রহস্যে পরিণত হইল, কিন্তু সকলের ভিতর কিরূপ একটা বুক খোলা

ভালবাসা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, তাহাই সকলে অনুভব করিতে লাগিলেন। কথাটা তুচ্ছ হইলেও সকলের ভিতর যে কি একটা ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল, তাহাই বোঝা যাইত, সংযত আদব্-কেতাদোরস্ত পোষাকি ভাব কিছুই ছিল না, সকলেই অকপটে পরস্পরকে ভালবাসিতেন।

যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র চন্দ্র—যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ি বাঁকুড়া জেলা কাকৃটে গ্রামে। পূর্বে দমদমার কোন স্কুল-এ শিক্ষকের কার্য করিতেন এবং মাঝে মঝে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইতেন। দমদম-মাষ্টার একবার বলিয়াছিলেন, "কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে দেবস্থানে যাইলে অন্ততঃ এক পয়সার বাতাসাও লইয়া যাইতে হয়, রিক্ত হস্তে যাইতে নাই।" দমদম-মাষ্টার তদনুযায়ী এক পয়সার বাতাসা লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাইতেন, কারণ তিনি অল্প বেতন পাইতেন, এই জন্য এক পয়সার বাতাসা লইয়া গিয়াছিলেন। বেতন সামান্য, এইজন্য অধিক জিনিস লইয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবিধ উৎকৃষ্ট আহার্য ত্যাগ করিয়া গরীব দমদম-মাষ্টারের বাতাসা খাইয়াছিলেন, ইহা অনেক গ্রন্থেই আছে।

দমদম মাষ্টারের মঠে থাকা—সম্ভবতঃ দমদম-মাষ্টারের সে চাকুরি যায়। তিনি বরাহনগরের মঠ স্থাপনের এক বৎসর পরে বরাহনগরের মঠে আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন এবং শিবানন্দমহারাজকে তাঁহার অবস্থার কথা জানাইলে তিনি বরাহনগরের মঠে আহারের দিক দেখিবার জন্য তাঁহাকে বলেন এবং মঠে থাকিবার আদেশও করিয়াছিলেন। যাহা হউক দমদম-মাষ্টার কখনও বরাহনগরের মঠে কখনও বা অন্যত্র থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও তিনটি পুত্র ছিল। তাহাদের ভরণপোষণের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া উঠিল। এই সময় বরাহনগরের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিধবা-আশ্রম' বেশ চলিতেছিল এবং দমদম-মাষ্টারকে বেশ উপযুক্ত লোক বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিধবা আশ্রমের অধ্যক্ষের কার্যে কর্তৃপক্ষরা নিযুক্ত করিলেন। এই

স্থানে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় যশের সহিত কার্য করিয়া কয়েক বৎসর পরে কর্ম পরিত্যাগ করেন। দমদম-মাষ্টার তখন আলমবাজার মঠের কাছে নিজের বাসা ঠিক করেন এবং অবসর পাইলেই মঠে আসিয়া সকলের সেবা শুশ্রূষা ও আবশ্যকীয় সকল কার্যই করিতেন। সকলেই তাঁহাকে স্বগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য করিতেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ভবানী-পুর। নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী না হইলেও সমসাময়িক পাঠী ছিলেন। ১৮৯১ সালে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং শনিবার ও রবিবার এমন কি অন্য দিনেও বিশেষ কার্য না থাকিলে আদালতের কাপড় পরিয়াই অর্থাৎ চোগা-চাপকান পরিয়াই আলমবাজারের মঠে চলিয়া আসিতেন। প্রায় দুই বৎসর তিনি সর্বদাই আলমবাজারের মঠে যাতায়াত করিতেন। তুলসীমহারাজ ও শরৎমহারাজের সহিত ইঁহার বেশী হৃদ্যতা ছিল। ইনি কখন কখন ভিতর বাড়ির পূর্বে উত্তর কোণের ঘরটিতে যেখানে ঠাকুরের ভাণ্ডার ছিল অর্থাৎ পূজার দ্রব্যাদি থাকিত, তথায় বসিয়া বেশ ভক্তিভাবে ঠাকুরের ফুলের মালা তৈয়ারি করিতেন, কখন কখন চন্দন ঘষিতেন, কখন বা তাঁহাকে দিয়া যাহা হইতে পারিত এরূপ কার্য করিতেন। যে কয়দিন তিনি আলমবাজারের মঠে থাকিতেন, প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন ও ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঠাকুরের পূজার কোন কোন সামগ্রী গুছাইয়া দিতেন এবং অপর সময়টি জপ করিতেন। রাত্রে শয়ন কালে তিনি বাইরের বড় ঘরের ভিতর যে ছোট ঘরটি আছে তথায় শুইতেন এবং তুলসীমহারাজও এক একদিন তাঁহার পাশে কম্বল বিছাইয়া শুইতেন। সতীশ মুখোপাধ্যায় এই সময় অনেক রাত্র পর্যন্ত জপ করিতেন। তুলসীমহারাজ মাঝে মাঝে বলিতেন, "ও সতীশ, রাত অনেক হলো, এখন একটু ঘুমাও, সমস্ত রাত জপ করলে ঘুম হবে না।" তাঁহার আহার অতি অল্প ছিল। একটি বাটিতে একটু ঝালের ঝোল ভাত দিয়া খাইতেন এবং এক সূর্যে দু'বার অন্ন গ্রহণ করিতেন না বলিয়া রাত্রে একটা বাটি করিয়া অল্প

'রিমাণে দুধ-ভাত খাইতেন। তখন তাঁহার স্বভাব বালকের মত ইয়াছিল। দেহ কৃশ, রং উজ্জ্বল, মুখ কিঞ্চিৎ লম্বা, চলন একটু ডাইনে য়ে হেলিয়া এবং কথায় জিবের একটু আড় ছিল। মুখে কোঁকড়ান াকড়ান অল্প দাড়ি। তিনি কখন কখন বৈকালবেলায় কোঁচার াপড়টি কোমরে ফেট্টি করিয়া বাঁধিয়া খালি গায়ে পূর্বদিকের রান্না র উপর যে ছাতটি ছিল তথায় মেঝের উপর শুইয়া থাকিতেন এবং স্থিরনেত্রে কোন বিষয় ভাবিতেন। মুখে খালি সাধন ভজনের কথা 'গিয়া থাকিত, অন্য কথা বড় কহিতেন না।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সেবা-ভাব—একদিন গিরিশ বাবু আলম-াজার মঠে যান। গরমকাল, রবিবার আহারের পর একটু বিশ্রাম 'রিতে ইচ্ছা করিলে উপরকার ঘরগুলো বড় গরম হওয়ায় তুলসী-হারাজ বাইরের বড় ঘরের নীচেকার এঁদো ঘরটি পরিষ্কার করিয়া াতুর পাতিয়া রাখিয়াছিলেন এবং একখানি বড় এড়ানি পাখাও তথায় রাখিয়াছিলেন। অনেকেই গিয়া সেই ঘরটির ভিতর শুইয়া রহিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় কথাবার্তা হইতে লাগিল; সতীশ মুখুজ্যে উঠিয়া এড়ানি পাখাখানি লইয়া সকলকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তুলসীমহারাজ, সতীশ মুখুজ্যের কষ্ট হইতেছে বিবেচনা করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। সতীশ মুখুজ্যে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি আর সকলের বিশেষ কি সেবা করিতে পারি? একটু বাতাস করে লোকের সেবা করতে পারব না?" এমন সবিনয়ে কথাগুলি বলিলেন যে সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। গিরিশবাবু শুনিয়া বলিলেন, "সতীশ, তুমি বাতাস কর, তুলসী, তুমি ওর ভক্তির উপর হাত দিও না যখন ভক্তি করে সেবা কচ্ছে করুক।" সতীশ মুখুজ্যে তখন অতি সংযত ও ভক্তিপূর্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া বড় এড়ানি পাখাখানি লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পর তিনি 'ডন্' (Dawn) নামক মাসিক পত্র বাহির করিলেন এবং তদবধি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সহিত আর বিশেষ কিছু সংশ্রব রাখিলেন না।

স্বামী প্রেমানন্দ—বাবুরামমহারাজ বরাহনগর মঠে যেমন সাধন ভজন করিতেন, আলমবাজার মঠে ততোধিক সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। অনেক দিন মধ্যাহ্নে আহারের পর মাথায় গামছাখানি ঢাকা দিয়া, কোঁচার কাপড়খানি গায়ে দিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পঞ্চবটিতে বসিয়া জপ করিতেন এবং বিকেল বেলা ফিরিয়া আসিতেন। বাবুরামমহারাজ এ সময় গৈরিক বসন পরিধান করিতেন না, সাদা কাপড় পরিতেন এবং সন্ন্যাসীর বাহ্যিক কোন চিহ্ন রাখিতেন না। কালীবেদান্তী অতি সতর্ক লোক, বাহিরের সিঁড়ির কাছে রাস্তার দিকে যে জানালাটি ছিল সেইখান থেকে বাবুরামমহারাজকে বাহির হইতে দেখিয়া বলিতেন, "বাবুরাম এবার চরা করতে বেরুল, আর কি—দিন কাটিয়ে আসবে।" পাতলা উজ্জ্বল বর্ণ যুবা বাবুরামমহারাজ তখন অতি দীন হীন নিরভিমান শান্ত ভালমানুষটি ছিলেন। সকলের কাছেই বিনীত এবং যেন সকলের কাছেই কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন। সেই সময় তাঁহার ভাব এত নম্র ও বিনীত হইয়াছিল যে তাঁহাকে দেখিলে লোকের মনে কষ্ট হইত। একেবারে যেন সকলের চেয়ে শান্ত ও নরম এবং তাঁহাকে কোনরূপ গালাগালি করিলেও তিনি তাহার কোন জবাব দিতেন না।

প্রেমানন্দ স্বামীর পঞ্চবটিতে গমন—গরমকালে কয়েকবার বাবুরাম মহারাজ বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘর ও পঞ্চবটীতে প্রণাম করিয়া অবশেষে বড় ঘাটটিতে উভয়ে আসিয়া বসিতেন এবং জলে পা ডুবাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় আলোচনা করিতেন। কথাবার্তায় এমন উন্মনা হইয়া যাইতেন যে অনেক সময় রাত্রি ৯টা ১০টা বাজিয়া যাইত। বাবুরামমহারাজের তখন কি সরল প্রাণ, কি অমায়িক ভাব কি বালকের মত স্বভাব! দেহ ধারণের জন্য আহার করিতে হয় তাই সামান্য আহার করিতেন। কোন বিষয়েই আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা নাই, কেবলমাত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটীতে বসিয়া যেরূপ সাধন ভজন করিয়াছিলেন

তাহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল। যদিও তিনি বাহ্যতঃ কিছু প্রকাশ করিতেন না কিন্তু অন্তরে সে বিষয় উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কালীবাড়ির কোন্ স্থানে বসিয়া কোন কথাগুলি কাহাকে বলিয়াছিলেন, বর্তমান লেখককে তাহা নির্দেশ করিয়া দেখাইতেন।

একদিন রাত্রি ৯টা বা ১০টার সময় দুইজনে আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে সদর দরজা বন্ধ। এতরাত পর্যন্ত বাহিরে থাকায় নিরঞ্জনমহারাজ রাগিয়া গিয়াছেন, তিনি উভয়কেই বাড়িতে ঢুকিতে নিষেধ করিলেন। বর্তমান লেখক তখন আব্দার ধরিলেন, "বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, আর থাকতে পারি না।" নিরঞ্জনমহারাজ তখন হাসিয়া ফেলিলেন এবং সস্নেহে বলিলেন, "আয় ভিতরে আয়, আমার জন্য আলুভাতে হয়েছিল তাই আমি তোর জন্য খানিকটা রেখে দিয়েছি; ও শ্যালা বৈরাগীকে ঢুকতে দিস্‌নে। শ্যালা বৈরাগী কেবল এখানে ওখানে বেড়াবে, জপ ধ্যান কি আর এখানে বসে হয় না?" বড় ভাইয়ের নিকট ছোট ভাই যেমন শঙ্কিত হইয়া থাকে, বাবুরামমহারাজ সেইরূপ লজ্জিত ও নির্বাক হইয়া সেই রাত্রে কিছু খাইয়া এক জায়গায় একান্তে বসিয়া জপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে উস্ খুস করছেন তাহাতেই বোঝা গেল যে নিদ্রা হয় নাই। কারণ তখন রাত্রে জপ করাই সকলের মধ্যে প্রথা ছিল, ঘুমিয়ে রাত কাটান দোষনীয় বিবেচনা হইত।

প্রেমানন্দ স্বামী ও মণি মল্লিক—একদিন বাবুরামমহারাজ বর্তমান লেখকের সহিত চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠিল যে চৈতন্যমহাপ্রভু বরাহনগরে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ দুইজনার ইচ্ছা হইল যে, সেই স্থানটি দর্শন ও প্রণাম করিয়া আসে। বাবুরামমহারাজ পূর্ববৎ মাথায় গামছাখানি চারপাট করিয়া দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, বর্তমান লেখকও সঙ্গে যাইবে; এমন সময় কালীবেদান্তী বাবুরামমহারাজকে বলিলেন,

"বৈরাগীর পেটে ভাত পড়লো—আর কি—ভাত হজম করতে হবে ; তাই চরা করতে বেরোচ্ছ। বলি ও ছোঁড়াটাকে এত রৌদ্রে ঘোরাচ্ছ কেন ? নিজে রৌদ্রে ঘুরে মরবে, তা মরগে যাওনা ; আবার ওটাকে জোটাচ্ছ কেন ?" যাহা হউক উভয়ে নির্গত হইলেন। তখন মালিপাড়ার চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থানটি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। বাড়ির অধিকাংশ স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সাধারণ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছু বলিতে পারিল না। দুইজনে দুপুরবেলা রৌদ্রে অনেক ঘুরিয়াও স্থানটি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মণি মল্লিকের গঙ্গার ধারের বাগান "তটিনী কুটীরে" প্রবেশ করিলেন। ভাগ্যক্রমে মণি মল্লিক সেদিন বাগানে গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা ঘরে উপস্থিত ছিলেন। বাবুরামমহারাজের সহিত অনেক কথাবার্তা হইতে লাগিল। মণি মল্লিক বলিলেন, "আমরা সংসারী লোক—ভোগবিলাসে থাকি, আমাদের আবার মুক্তি কোথায় হবে ; আর আপনারা সাধু-সন্ন্যাসী—যেন কামধেনু, সামান্য জটেবুড়ি (জড়িবুটি) খেয়ে অমৃত-দুধ দিয়া থাকেন।" জটেবুড়ির কথা শুনিয়া উভয়ের হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু বাহ্যিক ধৈর্য ধরিয়া বেশ ভক্তির সহিত আবার কথাবার্তা হইতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া দুইজনে জটেবুড়ির কথা লইয়া হাসিতে হাসিতে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রেমানন্দ স্বামীর সরল ভাব—বরাহনগরের মালিপাড়ার যে ভাঙ্গা বাড়িতে চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন হইয়াছিল, কয়েক বৎসর পরে জঙ্গল কাটিয়া সেই স্থানটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে মেরামত করা হয়। বর্তমান লেখক একবার দর্শন করিতে যান। উপস্থিত অধ্যক্ষেরা অতি যত্ন করিয়া বর্তমান লেখককে চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যবহৃত খড়ম দেখাইলেন। ইহা কেবল মাত্র পাতলা দু'খানি কাঠ, খড়মের বোগ্‌লো দুটি ছিল না। চৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে বসিয়া ভাগবত পাঠ শুনিতেন সেই স্থানটি একটি বেদীর মত বাঁধান রহিয়াছে এবং যে ভাগবতখানি শুনিতেন

তাহা অদ্যাপিও সংরক্ষিত আছে কিন্তু কাগজগুলি টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়ায় একটি পুঁটলিতে করে বাঁধা ছিল। পাতাগুলা যেন মুড়ির মত হয়ে গেছে, খুলিলেই ক্ষুদ্র অংশগুলি পড়িয়া যাইবে। বর্তমান, লেখক সমস্ত স্থানগুলি ও বস্তুগুলিকে প্রণাম ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

একদিন শীতকালের প্রথমে বাবুরামমহারাজ বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া আলমবাজারের গ্রামের ভিতর বেড়াইতে যাইলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি খুব তন্ময় হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা কহিতে-ছিলেন। পথিমধ্যে একখানি গোল পাতার ঘরের চালে লাউ ও লাউডগা দেখিতে পাইলেন। বর্তমান লেখক বলিলেন, "ডগাগুলি যেন ল-ল কচ্ছে, লাউডগা ভাতে দিয়ে খেতে বড় ভাল লাগে।" বাবুরাম-মহারাজ এত সরল ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, এই কথা শুনিয়া নিঃসঙ্কোচে সেই গোলপাতার বাড়িতে ঢুকিয়া একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে বলিলেন, "দ্যাখ, তোমাদের লাউডগা বেশ হয়েছে, আমাদের কিছু দাও—আমরা ভাতে দিয়ে খাব।" তিনি এমন সরল ও মিষ্টবাক্যে কথা কহিলেন যে স্ত্রীলোকটি অতি আগ্রহে বাস্তসমস্ত হইয়া লাউডগা কাটিয়া বাবুরামমহারাজকে দিলেন। বাবুরামমহারাজের কণ্ঠস্বরে এমন একটি স্নিগ্ধ আকর্ষণী শক্তি ছিল যে স্ত্রীলোকটি ভক্তি করিয়া বাবুরাম-মহারাজকে লাউডগা দিয়া কৃতার্থ মনে করিলেন। ইহাকেই বলে দেবভাব, সর্ববস্তুকে আকর্ষণ করে।

যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়—শীতের প্রথমে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরুভাইদিগের পরিচিত মীরাট নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক বালী হইতে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া সন্ধ্যার সময় আলমবাজার মঠে আসিয়া পৌছিলেন। তিনি ক্লান্ত ও শীতার্ত হইয়া বড় ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। মুখ হাত পা ধুইয়া ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া পুনরায় পূর্বস্থানে বসিলে বর্তমান লেখক তাঁহাকে একবাটি চা আনিয়া দিলেন। তিনি চা পান করিয়া পরিতুষ্ট হইয়া বর্তমান লেখকের সহিত কনিষ্ঠ

ভ্রাতার ন্যায় কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন এবং অপর সকলের সহিতও বন্ধুভাবে সসম্মানে কথা কহিতে লাগিলেন। অনেকের পরিচিত থাকায় সকলেই তাঁহাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেল যে ইঁহার নাম যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী ভক্তেরা যখন মীরাটে ছিলেন তখন তাঁহাদের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা হইয়াছিল।

স্বামী জ্ঞানানন্দ ও বর্তমান লেখক—১৯০৫ বা ১৯০৬ সালে খেতড়ি মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও স্বামীজীর শিষ্য মুনসি জগমোহনলাল অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ও একটি সাধুকে লইয়া বেলুড় মঠে আসেন। সাধুটির গৈরিক বসন, কাঁধ পর্যন্ত লম্বাচুল জীর্ণ-শীর্ণ কলেবর, চক্ষু উজ্জ্বল এবং হাতে ছোট একটি বেতের ছড়ি ছিল। গঙ্গারদিকের দক্ষিণ কোণের ঘরটিতে আসিয়া সকলে বসিয়াছেন এবং সাধুটি হাঁটুদুটি উচু করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া এদিক ওদিক নিরক্ষণ করিতেছেন। বর্তমান লেখক মাড়োয়ারী দেশীয় সাধু বিবেচনা করিয়া প্রণাম করিয়া হিন্দিতে কথা কহিবার উপক্রম করিলে সাধুটি তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট ও স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, "মহিন, কেমন আছ?" এইরূপ ভাবে সম্ভাষণ করিতে শুনিয়া বর্তমান লেখক চমকিত হইয়া উঠিলেন। সাধুটি বলিলেন, "আমায় চিনতে পাচ্ছ না? মীরাট থেকে সেই আলমবাজারের মঠে এসেছিলুম, তুমি রাত্রে আমায় চা করে খাওয়ালে—আমি সেই যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়।" উক্ত পরিচয়ে উভয়ে পরম প্রীত হইলেন এবং অন্যান্য সকলের সহিত নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। তাঁহার নাম স্বামী জ্ঞানানন্দ—কাশীধামে 'ভারত ধর্মমহা-মণ্ডলী'রও অধিনায়ক।

দাশরথি সান্ন্যালের অভিনয়—একটু শীত পড়িয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল দাশরথি সান্ন্যাল তখন যুবক, নরেন্দ্র-নাথের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর খুব হর্ষিত হইয়া বড় ঘরটিতে আসিয়া বসিলেন। কিছুদিন পূর্বে এক ইংরাজ

থিয়েটারের দল Corinthian Theatre ভাড়া লইয়া Shakespeare-এর Merchant of Venice অভিনয় করে—সেই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। দাশরথি সান্ন্যাল সহসা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং গঙ্গাধরমহারাজ তিব্বত হইতে যে পশমের লম্বা জামাটি পরিয়া আসিয়াছিলেন সেই জামাটি গায়ে দিয়া কোমরে একখানা কাপড় জড়াইয়া শাইলক (Shylock)এর পালাটি, মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও চোখের চাহনি নানারূপ পরিবর্তন ও হস্ত সঞ্চালন করিয়া এমন সুন্দরভাবে অভিনয় করিতে লাগিলেন যে তাহা দেখিয়া সকলেই তাঁহার নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অভিনয় কার্যে তিনি অশিক্ষিত হইলেও এরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া সকলের বোধ হইতেছিল যেন তাঁহারা প্রকৃত রঙ্গালয়েই উপস্থিত আছেন।

চৌধুরী মহাশয়—চৌধুরী মহাশয় যোগেনমহারাজের পিতা। দক্ষিণেশ্বরের সাবর্ণ চৌধুরীদিগের একজন কর্তা। ইঁহারা ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন মাননীয় বংশ। কথাবার্তায় চৌধুরী মহাশয় বিশেষ নিপুণ এবং কৌতুক রহস্যে তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল।

আলমবাজারের মঠ দক্ষিণেশ্বর গ্রামের সন্নিকটে হওয়ায় চৌধুরী মহাশয় কখন প্রাতে, কখন বৈকালে আসিয়া সকলের সহিত কথাবার্তা কহিয়া যাইতেন। দেখিতে দীর্ঘকায়, বর্ণ সাধারণ, শরীর দোহারা, পেট বসা এবং মেরুদণ্ড সম্মুখের দিকে কিছু বক্র; উভয় কর্ণ কিছু লোমযুক্ত, এবং ভ্রূদ্বয় প্রশস্ত ও লোমযুক্ত। মস্তক সর্বদাই এদিক ওদিক সঞ্চালন করিতেন এবং চক্ষুদ্বয় সতর্ক। বামস্কন্ধে একখানি কোঁচান চাদর, পরিধানে একখানি মলমল থান, বক্ষঃস্থলে যজ্ঞোপবীত, হাতে কখন একটা লাঠি বা ছাতি থাকিত, কোঁচার ডগাটা বাঁদিকের কসিতে গোঁজা।

চৌধুরী মহাশয়ের হাস্য কৌতুক—চৌধুরী মহাশয় আলমবাজারের মঠে আসিলে যোগেনমহারাজের পিতা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে সুরু করিতেন,

"আর আমার বেঁচে সুখ নাই ; বাপের নামে বেটার পরিচয় হয়, আর আমার কিনা বেটার নামে বাপের পরিচয়। যেন নন্দ ঘোষের দশা নন্দের বেটা কেউ ত বলে না, কেষ্টর বাপ নন্দই সকলে বলে থাকে আর আমি যেখানে যাই সেখানে যোগের বাপ বলে সকলে সম্মান করে আর আমার বেটা যোগে কেউ বলে না। একেই বলে পোড়াকপাল।" তাহার পর কালীবেদান্তীর সহিত একবার একপালা হইত। চৌধুরী মশাই বলিতেন, "মা কালীই ত সকলে বলে থাকে, এ যে দেখি বাবা কালী।" এইরূপ কালীবেদান্তীর সহিত কিছুক্ষণ হইত। তাহার পর নিতান্ত ভালমানুষ বাবুরামমহারাজ কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়ে সুমুখ দিয়া যখন যাতায়াত করিতেন তখন তাঁহার উপরও একপালা হইত, "ইনি দিদিবাবু না দাদাবাবু?" বাবুরামমহারাজ হাস্য-কৌতুকে অপ্রস্তুত হইয়া ঠাকুর ঘরের পার্শ্বের সিঁড়িটা দিয়া অনেক সময় সরিয়া যাইতেন। বর্তমান লেখকের সহিতও বিশেষ হাসি তামাসা হইত

তিনি গল্প বলিতে সুনিপুণ ছিলেন। কলিকাতার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বাড়ির সমস্ত গল্প অভিনয়চ্ছলে হুবহু বলিয়া যাইতেন। লর্ড ক্যানিং (Lord Canning)-এর পত্নী লেডি ক্যানিং (Lady Canning)-এর কিরূপ সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়া ছিল, কিরূপে ইংরাজ ডাক্তারগণ চিকিৎসা করিতে লাগিল, সুবিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিরূপে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিয়া দিলেন—হস্ত সঞ্চালন ও নয়নভঙ্গি করিয়া তিনি অভিনেতার ন্যায় সুন্দরভাবে গল্পগুলি বিবৃত করিতেন। চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় গল্প করিবার নৈপুণ্য অতি অল্প লোকেরই ছিল। অনবরত তিনি দুই তিন ঘণ্টা গল্প বলিয়া যাইতে পরিতেন এবং শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তিনি নূতন প্রকার হাস্যকৌতুকের শব্দ রচনা করিতে পারিতেন এবং সেকালে ভট্টাচার্য পণ্ডিতের মত সাধু ভাষাতেই কথা কহিতেন। সামান্য কথাতেও তিনি সাধু শব্দ ব্যবহার করিতেন। 'ভিজা কাপড়' না বলিয়া 'আদ্র বস্ত্র' বলিতেন, 'বৃদ্ধ' না বলিয়া 'স্থবির' বলিতেন।

যাহা হউক তিনি সকলের বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন এবং সর্বদাই মঠে আসিয়া সকলকে দেখিয়া যাইতেন।

হৃদয় মুখোপাধ্যায়—হৃদু মুখুজ্জে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কিছুদিন কাজ কর্ম করিয়াছিলেন। তাহারপর কাঁকুড়গাছি রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানে পূজারী নিযুক্ত হন কিন্তু নানা কারণবশতঃ সেই কার্য হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা হইয়াছিল। তাহারপর তিনি তসরের কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া পরিচিত বাড়িতে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। একদিন কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া আলমবাজারের মঠের সম্মুখ দিয়া বেলা ৯৷৷০ বা ১০টার সময় যাইতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার মঠে একবার তামাক খাইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। তিনি বড় ঘরটিতে পুঁটুলিটি রাখিয়া ভিতর বাড়িতে আসিয়া ঠাকুর প্রণাম করিয়া শিবানন্দ স্বামীর কাছে তামাক খাইতে গেলেন। শিবানন্দ স্বামী তখন ভিতর বাড়ির দক্ষিণদিকের বারান্দায় ও পূর্বদিকের ফাঁকা ছাতের সঙ্গমস্থলে বসিয়া একটি ছোট হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। নিরঞ্জনমহারাজ পূর্বদিকের খোলা ছাত ও ঠাকুরের ভাঁড়ারের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি মুখুজ্জে! কেমন আছ?" হৃদু মুখুজ্জে বলিলেন, "আর দাদা—মরে আছি, আর কি সে দিন আছে? মামা গেছেন, তার সঙ্গে আমার প্রাণও চলে গেছে; খালি দেহটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তবে পেটটা ত আছে, তাই কিছু চেষ্টা কর্তে হয়।"

হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও কেশব সেন সম্বন্ধে গল্প বলা—শিবানন্দ স্বামীর হাত থেকে হুঁকাটি লইয়া হৃদু মুখুজ্জে উপু হইয়া বসিয়া বার কতক তামাক টানিলেন। শিবানন্দ স্বামী বলিলেন, "হ্যাঁ হে মুখুজ্যে, তিনি যখন কেশববাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন তুমি ত সঙ্গে ছিলে—কি সব হয়েছিল একবার বলত।" হৃদু মুখুজ্যে বলিতে লাগিলেন, "একটা গাড়ি করে মামার সঙ্গে আমি ক্যাশববাবুর বাড়ি চলিলাম। গাড়িতে আমি মামাকে বলিতে লাগিলাম, 'ক্যাশববাবু বড় মানুষ, বড় লোক, তার বাড়িতে গিয়ে তুমি এমন বেফাঁস এলোমেলো

কথা বল কেন? তুমি বড়···'আমি এই রকম বলিতে বলিতে গাড়িতে চলিলাম। মামা তখন একখানা লালপেড়ে ধুতি পরে আছেন। ক্যাশববাবুর বাড়িতে গাড়ি পৌঁছিলে যত্ন করে তাহারা ক্যাশববাবুর ঘরে লয়ে গেল। ক্যাশববাবু যত্ন করিয়া অগ্রসর হইয়া মামাকে বসাইতে গেলে মামা বলিতে লাগিলেন, 'ও ক্যাশব, আমি তোমায় কি বলেছি? হৃদু তাই পথে আমায় বোকছিল আর আমায় এই কথা বলে গাল দিচ্ছিল···'ক্যাশববাবুর কাছে তখন জনকতক লোক বসেছিল, ক্যাশববাবু আহ্লাদ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃদু আপনাকে রাস্তায় কি বলে গাল দিয়েছে?' মামা আবার সেই কথাটি বলিলেন। তখন ক্যাশববাবু খুব উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। আবার একটু পরে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'হৃদু আপনাকে কি বলে গাল দিয়েছে? মামা আবার সেই কথাটি বল্লেন। ক্যাশববাবু আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলেন। মামার সরল গ্রাম্য কথা ক্যাশববাবুর কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল আর সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। তারপর ক্যাশববাবু আনন্দ ও কৌতুকচ্ছলে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'আজকে কি মনে করে এসেছেন?' মামা বললেন, 'ক্যাশবের মন ভোলাতে, এই দূতীগিরি করবো বলে এসেছি' এই বলিয়া তাঁহার পরনের লালপেড়ে কাপড় খানি মাথায় ঘোমটার মত দিয়া দূতী সাজিলেন এবং ক্যাশববাবুর মুখের কাছে হাত নেড়ে দূতী সংবাদ গাহিতে লাগিলেন। ক্যাশববাবু আনন্দে উল্লসিত হইয়া তাড়াতাড়ি খোল লইয়া নিজেই বাজাইতে লাগিলেন আর মামা নৃত্য করিয়া দূতী সংবাদ গাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে উহা শুনিয়া আহ্লাদে টুপ্‌টুপ্ হইয়া উঠিলেন।"

হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের দূতী সংবাদ অভিনয় করা—এই কথা বলিতে বলিতে হৃদু মুখুজ্যের পূর্বস্মৃতি স্পষ্টভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল। নিজের পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচাটি মাথায় দিয়া স্বয়ং দূতী সাজিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দূতী সংবাদ অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত নাড়িয়া দূতী সংবাদ গাইতে লাগিলেন। যাহা হউক মুখুজ্যে সেই সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পষ্ট ভাবটি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে সকলেই মহা আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে হুহ্ মুখুজ্যেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় অনেক প্রশ্ন করা হইল এবং তিনি যে সব বিষয় জানিতেন, তাহার কিছু কিছু উত্তর দিতে লাগিলেন। ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল; সকলে স্নানের জন্য চলিলেন; স্নানের পর তিনি সকলের সহিত আহার করিয়া নিজের পুঁটুলিটি লইয়া পুনরায় কাপড় বেচিতে চলিয়া গেলেন।

আলমবাজারের মঠে তিনি কখন কখন আসিতেন এবং শশীমহারাজ কথাপ্রসঙ্গে তাঁর পূর্বস্মৃতি জাগ্রত কারবার চেষ্টা করিতেন; তাঁহারও মাঝে মাঝে পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিত। তাঁহাকে অনেকেই বিশেষ সম্মান করিতেন। ১৮৯৫ সালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে উৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দুঃখ করিয়া তিনি একটি কথা বলিয়াছিলেন, "যখন কেউ আসেনি তখন আমি মামার এত করে সেবা করেছিলুম কিন্তু এখন আমায় কেউ পোঁছে না। বেড়ালটা একবার দুধে মুখ দিয়েছে বলে তাকে কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়?" সান্ন্যালমশাই তখনকার উৎসবে একজন প্রধান উদ্যোগী লোক। তিনি হুহ্ মুখুজ্যের এই কথা শুনিয়া বড় ব্যথিত হইয়া তাঁকে গোপনে কিছু কিছু দিতেন, তিনি সেই সামান্য পাইয়াই পরিতুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন।

কিশোরীমোহন রায়—কিশোরীমোহন রায়ের বাড়ি বনহুগলী গ্রামে—আলমবাজারের মঠের অনতিদূরে। ১৮৯০ বা ১৮৯১ সালে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তিনি দাহ করিয়া আসিয়া বৈকালবেলা বড় ঘরটিতে বিমর্ষভাবে লম্বা হইয়া শুইয়া রহিলেন। আধঘণ্টা পরে হঠাৎ হুঙ্কারপূর্বক লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং ভিতর বাড়ির পূর্ব দিকের খোলা ছাতটিতে গিয়া সতীশ মুখুজ্যের সহিত নানা হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। শোকের কথা যেন অনেকটা ভুলিয়া গেলেন। তাহার জন্য সকলেই একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহার হর্ষ দেখিয়া

সকলের সে চিন্তা দূর হইল। একটা কিছু কাজ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সর্বদাই হাস্যমুখ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নরেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল এবং নরেন্দ্রনাথও ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

শিবানন্দ স্বামী ও লালা বদ্রিসা—শিবানন্দ স্বামী এতবার বাহিরে গিয়াছিলেন ও ফিরিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহার পর্যটনের কোন হিসাব রাখা যায় না এবং কোন্ বারে কোন্ কোন্ জায়গায় গিয়াছিলেন তাহাও মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে যাহা কিছু স্মরণ আছে তাহাই এখানে বিবৃত হইল। তিনি আলমোড়ায় গিয়াছিলেন এবং তথায় তথাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি লালা বদ্রিসা থুলঘড়িয়ার সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। বদ্রিসা তদবধি শিবানন্দ স্বামীর বিশেষ ভক্ত হইয়াছিলেন ও শিবানন্দ স্বামীকে সর্বদা চিঠি লিখিতেন এবং পার্বতীয় অনেক জিনিস তিনি আলমবাজারের মঠে পাঠাইতেন। তিনি জম্বু ঘাস (তরকারিতে ফোঁড়ন দিলে হিংয়ের মতন গন্ধ হয়—একপ্রকার পাহাড়ি শুকনো ঘাস) থুল খুসিয়ানি (কামরাঙ্গার ন্যায় বড় বড় একজাতীয় লঙ্কা—ঈষৎ ঝাল ও কাঁচা লঙ্কার ন্যায় সুগন্ধি), আপেল ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য মাঝে মাঝে পাঠাইতেন এবং মঠের বিশেষ অনুগত ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন সন্ন্যাসী শিষ্য আলমোড়ায় যাইলেই বদ্রিসার বাড়িতে অবস্থান করিতেন। বদ্রিসার বৃদ্ধা মাতা ও ভ্রাতাগণ সকলেই মঠের সন্ন্যাসীগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাঁহার একটি সন্তান হইলে ছেলেটির নাম সিদ্ধদাস রাখিয়াছিলেন।

একদিন শিবানন্দ স্বামীর আলমোড়ায় অবস্থান কালে ই. টি. ষ্টার্ডি নামক জনৈক ইংরাজের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। শিবানন্দ স্বামী ষ্টার্ডির সহিত মাদ্রাজে গিয়াছিলেন। এই ষ্টার্ডির বাড়িতেই আমেরিকা হইতে স্বামীজী ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

শিবানন্দ স্বামীর মঠে প্রত্যাগমন—শিবানন্দ স্বামী আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করিয়া ষ্টার্ডির ও দক্ষিণ দেশের নানাবিষয় কহিতে

গিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিলেন, "মান্দ্রাজে এক সম্প্রদায়
শ্চান আছে, যাহাদের টমাশ ক্রিশ্চান বলে। এইরূপ প্রবাদ যে,
শুর শিষ্য টমাশ তথায় আসিয়া তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।
চার ব্যবহারে প্রায় হিন্দুরই ন্যায় তবে ধর্মে তাহারা ক্রিশ্চান।
দত কোন ক্রিশ্চান ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর তাহারা নয়।" বর্তমান
থক শিবানন্দ স্বামীর কাছে টমাশ ক্রিশ্চানদের খবর এই প্রথম
নেন এবং পরে অন্যান্য গ্রন্থেও কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। সেই
য় তিনি গলা হইতে পা পর্যন্ত একটা রেশমের জামা আর একজোড়া
দ্রাজি চটি পায়ে দিয়া আসিয়াছিলেন। বর্তমান লেখক সেই মান্দ্রাজি
টি শিবানন্দ স্বামীর কাছ হইতে চাহিয়া লইলেন। তিনি হাস্য ও
তুক করিতে করিতে প্রসন্ন হইয়া তাহা দিলেন এবং সন্ন্যাল মহাশয়ও
ই গরদের লম্বা জামাটি চাহিয়া লইলেন। তিব্বত হইতে আনিত
াধরমহারাজের লম্বা পশমী জামাটি সান্ন্যাল মহাশয় পূর্বে লইয়া গিয়া
টাইয়া নিজের গায়ের মতন কোটজামা তৈয়ারি করাইয়াছিলেন এবং
ই দুটি জিনিস পাইয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

নিরঞ্জনানন্দ স্বামীর অজীর্ণ রোগ—এই সময় নিরঞ্জনমহারাজের
জীর্ণরোগ দেখা দিল। সদাই তাঁহার পেটের অবস্থা খারাপ। কখন
ই আলমবাজারের মঠে, কখন বলরামবাবুর বাড়িতে, কখন বা অন্যত্র
ন করিতে লাগিলেন। আহারাদি বিশেষ নিয়ম পালন করিয়াও
হার কোন উপশম হইল না, কয়েক বৎসর ভুগিয়া ক্রমেই শরীর
ল হইতে লাগিল। তিনি আর পূর্বের ন্যায় সকল কার্যে উৎসাহ ও
নন্দসহকারে যোগ দিতে পারিতেন না। অনেক সময় ম্রিয়মান
য়া থাকিতেন, কখন বা পূর্বের ন্যায় হর্ষিত হইয়া কার্য করিতেন।
বতঃ তিনি প্রফুল্লচিত্ত ও লোকরঞ্জক ছিলেন এবং সকলের সহিত
দরে বাক্যালাপ করিতেন কিন্তু এই সময় শরীর অসুস্থ থাকায় সব দিন
ান থাকিতেন না। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর এই পীড়া
াগ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সেই সময় বেলুড় গ্রামে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন বাড়িখানি একতলা, শুধু সিঁড়ি দিয়া ছাতে উঠিবার স্থানটিতে একখানি ছোট ঘর এবং নীচেতে কয়েকটি মাত্র ঘর ছিল। যোগেন মহারাজ অভিভাবক হইয়া বাহিরের সমস্ত কার্য দেখাশুনা করিতেন এবং গোলাপ মা-ও অপর স্ত্রী ভক্তেরা ভিতরের কার্য দেখিতেন। রবিবার বা অন্য কোন বিশেষ দিনে পুরুষ ভক্তেরা যাইলে বাহিরেই থাকিতেন এবং যোগেনমহারাজের সহিত কথাবার্তা কহিতেন, ভিতরে যাইবার কাহারও অধিকার ছিল না। পুরুষ-ভক্তেরা বৈকালে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বা ফল প্রসাদ পাইতেন, তখন অন্য প্রসাদের কোন ব্যবস্থা ছিল না। গোলাপ-মা তখন বাহিরের ভক্তদের সহিত কথা কহিতেন ও সকলকে বিশেষ যত্ন করিতেন। স্থানটি গঙ্গার ধারে, সামনে ঘাসওয়ালা উঠান, পিছনে কিছু কলাগাছ ও সুপারিগাছ ছিল। যাহা হউক, স্থানটি অতি নিরিবিলি ও সুরম্য। গঙ্গার পাঁদাড়ে নেপালীদিগের বড় বড় শালকাঠ বরাবর কিনারাময় পাতা ছিল, কারণ বেলুড় গ্রাম তখন শালকাঠের আড়ৎ।

যোগানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক—কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাস, যোগেনমহারাজ একটি গৈরিক রঙের হাঁটুর নীচে পর্যন্ত তুলাভরা জামা পরিয়া গঙ্গার ধারে বসিয়া আছেন। জামাটির তৈয়ারিতে কিছু বিশেষত্ব ছিল। বর্তমান লেখক উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কোন্ দেশী জামা?" যোগেনমহারাজ বলিলেন, "এ হচ্ছে পশ্চিমের তুলোভরা জামা।" বর্তমান লেখক বলিলেন, "হাঁ একখানা লেপকে কেটে সেলাই করে জামা করেছে।" যোগেনমহারাজ তাহা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বর্তমান লেখক বারংবার কহিতে লাগিলেন, "লেপের জামা, লেপের জামা" এই কথা শুনিয়া কালীবেদান্তী ও অপর সকলে যোগেনমহারাজের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন, "কিরে যোগে, তোর বুঝি শীত করে, তাই লেপ্ কেটে জামা করে গায়ে দিয়ে

সারাদিন রোদ পোয়াস !" কথাটা অতি তুচ্ছ হলেও তখন সকলের প্রাণ এত সরল ও পরস্পরের প্রতি এরূপ ভালবাসা ছিল যে সামান্য কার্যেও সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বৈরাগ্য ভাব—এই সময় গিরিশবাবুর খুব বৈরাগ্যভাব হয়। তিনি অনবরত জপ করিতে থাকেন এবং থিয়েটার ও সংসারের সকল কার্য হইতে অবসর লইতে ইচ্ছা করেন। শুধু ভক্তবৃন্দদের লইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও সাধন ভজনের নানা সোপানের উচ্চ অবস্থার কথা কহিতেন। তখন তিনি নরম, ধীর ও একেবারে বালকের মতন হইয়া গিয়াছিলেন। সংসারের বা অন্য কোন বাজে কথা কেহ কহিলে তিনি অনেক সময়ে বিরক্ত হইতেন। ভক্তদের লইয়া আহার-বিহার ও ওঠা-বসা করিতেন, বাহিরের লোককে বড় একটা আসিতে দিতেন না। সকলেই তাঁহাকে ঐকান্তিক ভাবে জপ ধ্যান করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় মাষ্টার মহাশয়, শরৎমহারাজ এবং আরও কয়েকজন বলরামবাবুর বড় ঘরটিতে বসিয়া আছেন। গিরিশবাবু সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাপড়ের ডানদিকের ট্যাঁকে কতকগুলো পান ছিল। তিনি সেইগুলি বাহিরের কাগজের উপর রাখিয়া উত্তেজিতভাবে সাধন ও ভজনের কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার রাধাকৃষ্ণের ছবির দিকে চক্ষু পড়িল, তিনি কৃষ্ণের বঙ্কিম নেত্রের বিষয় একাধারে রহস্য ও ভক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন। একদিকে যেমন ব্যঙ্গ করিতেছেন অপরদিকে তেমনি আবার প্রগাঢ় ভক্তি দেখাইতেছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইলেন। তিনি মাঝে মাঝে দুই হাত তুলিয়া রাধাকৃষ্ণের ছবিতে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের রামপ্রসাদী গান শুনা—এমন সময় এক রাত-ভিখারি রামপ্রসাদী পদ—

"মার সোহাগে বাপের আদর"

গাহিতে গাহিতে বলরামবাবুর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল। চলিত রামপ্রসাদী পদ, চলিত গান কিন্তু গিরিশবাবুর গানটি এত ভাল লাগিল যে তিনি গায়কটিকে উপরে ডাকাইয়া আনাইয়া আপন সম্মুখে বসাইয়া রামপ্রসাদী পদ গাহিতে বলিলেন। লোকটি তিন চারিটি গান গাহিলে গিরিশবাবু তাহাকে দুই আনা পয়সা দিলে সে চলিয়া গেল। গিরিশবাবু শরৎমহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ শরৎ, এই রামপ্রসাদী পদ এমন তেজী ভাবের যে ইহাতে মনের angularity থাকে না, মনটাকে একেবারে সিদে চোস্ত করে দেয়," কথাগুলি কহিতে কহিতে তিনি আরও উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। সে দিন যেন ভক্তি ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। স্বতন্ত্র গিরিশবাবু, স্বতন্ত্র ভাব।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও জনৈক সন্ন্যাসী—অবশেষে তিনি একটি জটাধারী সন্ন্যাসীর গল্প আরম্ভ করিলেন, "দেখ, এক দিন দুপুরবেলায় একটা জটাধারী ছাইমাখা চিমটে হাতে সন্ন্যাসী এসে আমাদের ঠাকুর দালানে বসিল। সন্ন্যাসী দেখলেই-ত মেয়েদের হাত দেখান আছেই। আমি বৈঠকখানা ঘরে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে কি বলে শুনতে লাগলুম, ঝি মাগি সে বাড়ির সব কথা আগেই তাকে বলে দিয়ে গেল। সন্ন্যাসী গণৎকার তখন ত কৃতবিদ্য। বাড়ির মেয়েরা এসে যেমনি হাত দেখায় আর সন্ন্যাসী অমনি পট্ পট্ করে সব বলে দেয়। আমার ত রাগে গা গস্ গস্ করতে লাগলো। চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে শুয়ে রইলুম। যখন বুঝলুম মেয়েরা সব বাড়ির ভেতর চলে গেছে তখন আমি নেমে এলুম। এসে ঠাকুরদালানের সম্মুখের করবিগাছের গোটাকতক ডাল ভেঙে নিয়ে এই আর কি সন্ন্যাসীকে মার আর তাড়া। সন্ন্যাসী যত গলি দিয়ে পালাতে থাকে আমি তত করবিগাছের ডাল নিয়ে মারতে সুরু কল্লুম", এই কথা বলিতে বলিতে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর পলায়ন ক্রীড়া কবিতায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কবিতাটি এত

সুন্দর হইয়াছিল যে বর্তমান লেখক তাহা লিখিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এত শীঘ্র বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাহা লিখিয়া রাখা অসম্ভব হইয়াছিল।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জনৈক সন্ন্যাসীকে ভৎর্সনা করা—গিরিশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন তাহার পর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "দেখ শরৎ! অতুলের মেয়ের অসুখের সময় অতুল চিকিৎসা করবার জন্য কোত্থেকে একটা সন্ন্যাসী এনে ঠাকুর-দালানে রাখলে। মিন্‌ষে খায় দায় থাকে আর কি ওষুধ-পত্তর করে। অতুলের একটি মাত্র মেয়ে, তার অসুখ করেছে, তা সে যা ভাল বোঝে করুক বাবু, আমি কিছু বলতুম না। একদিন দুপুরবেলা আর থাকতে পারলুম না, এদিকে ওদিকে কেউ নেই দেখে আমি চুপি চুপি এসে সন্ন্যাসীর কাছে বসলুম, বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "বলি ও সন্ন্যাসী ঠাকুর! বলি ও সন্ন্যাসী ঠাকুর! তুমি ত সব রোগের দাওয়াই কচ্ছো! বলি তোমার যে ভবরোগ হয়েছে তার কোন দাওয়াই কচ্ছো কি? সে দিকে মন দাওনা কেন?" এ কথা বলেই আবার এদিক ওদিক চেয়ে পোঁ করে পালিয়ে এসে উপরের ঘরে ঢুকে পড়লুম। কি জানি কেউ দেখে ফেলবে, আবার কোন কথা হবে। সন্ন্যাসী ঠাকুরও কিন্তু সেই দিন থেকে ডেরা ওঠালো।"

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর গভীর বিশ্বাস—একদিন গিরিশবাবু বলরামবাবুর ঘরটিতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমাদের একটা ছোঁড়া উড়ে চাকর ছিল। কলতলাটা পেছলা ছিল—সেখানে গিয়ে ধুপ করে সে পড়ে যায়—তাইতে তার ডান হাতটা মচ্‌কে গিয়ে বড় যন্ত্রণা হল ও ফুলে উঠল। উড়ে ছোঁড়াটা কাঁদতে লাগল। আমি বল্লুম, 'তুই এই টাকাটা নে—নিয়ে এক টাকার জিলিপি কিনে দক্ষিণেশ্বরে চলে যা। সেখানে এক সাধু আছে, তাঁর কাছে খাবারটা দিয়ে বলবি যে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে আপনি হাত বুলিয়ে জায়গাটা ভাল করে দিন। চাকরটাও ঠিক সেইরূপ কল্লে।

ফিরে এলে আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'কিরে, সাধু কি বল্লে'? চাকরটা বল্লে, 'সাধু বল্লে, ভাল হয়ে যাবে।' কিন্তু তখনও তার হাতের হাড়টা বেঁকে রয়েছে, আর কিছু ফুলেও রয়েছে। আমি বল্লুম, 'সাধু যখন বলেছে তখন তোর নিশ্চয়ই ভাল হবে। যা ভয় করিস না'। তার পরদিন যখন সে কলতলায় গেছে, আবার পা পিছলে ধুপ করে পড়ে গেছে আর যেমনি পড়ে যাওয়া ওমনি যে হাড়ের গাঁটটা বেঁকে গেছলো সেটা ঠিক বসে পোড়লো। আহ্লাদ করে আমায় এসে দেখালে। আমি বল্লুম, দেখলি সাধুর কথা কেমন ঠিক হয়।"

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও স্বামী সারদানন্দ—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে উৎসব হইবে। বলরামবাবুর বাটীতে উৎসবের ফর্দাফর্দির সভা বসিল? একদিন সকাল ৯টা ১০টার সময় গিরিশবাবু আসিলেন। খানিকক্ষণ উৎসবের কথা শুনিয়া গিরিশবাবু বলিলেন, "দেখ শরৎ! আমি একটা কথা বলি, উৎসবে অনেক গণ্যমান্য বড় লোক যাবেন —তাঁদের জন্যে উৎসবে প্রসাদের আলাদা বন্দোবস্ত করলে হয় না? তাঁরা সমাজে একটা মান্য পেয়ে থাকেন। তাই প্রসাদের একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করে রাখা উচিত নয় কি?"

শরৎমহারাজ বলিলেন, "এত ভিরে দু'রকম বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। সে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আর সামাজিকতার কথা যা বল্লে, এ ত সে ভাবের নয়, এযে প্রসাদ পাওয়া, এখানে সকলেই সমান।" গিরিশবাবু বলিলেন, "তবুও তাঁহারা ত সমাজে একটা মান্য পাইয়া থাকেন, এখানে পাবেন না কেন?" বর্তমান লেখক বলিলেন, "এটা তীর্থক্ষেত্র—সমাজে বড ছোট থাকিতে পারে, মানী অমানী হইতে পারে কিন্তু তীর্থে সকলেই সমান। শ্রীক্ষেত্রে কেউ কি বড় ছোট বিবেচনা করে? সমাজ ওসব বড় ছোট বিচার করে, শুধু এই মহাতীর্থস্থানে বড় ছোট বিচার উঠিয়া গিয়া সকলে এক হয়ে যাবে।" তাহার পর সে কথা মিটিয়া গেল, সকলেই একমত, গিরিশবাবু বলিলেন, "এখানে ছোট বড় নেই, সব এক—এ ভাল কথা।"

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের আদি ব্রাহ্মসমাজের গল্প বলা—তাহার পর তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখ শরৎ, আগে আমি আদি ব্রাহ্ম-সমাজে খুব যেতুম। একদিন একটি পূর্ব্বদেশীয় লোক আসিয়া বেদিতে বসিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি বক্তৃতাকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভগবানের দ্বারের দ্বারপাল বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার হাতে ধর্মদণ্ড আছে, তাহার দ্বারা গতাগতি নিয়মিত করিতেছেন। বর্ণনাটি বেশ হইয়াছিল, তাহাতে এমন কোন বিশেষ দোষ হয় নাই। পরদিন আমি কেশববাবুর বাড়িতে গেলুম; কথাপ্রসঙ্গে একটি লোক বলিতে লাগিলেন, 'শুনেছেন মশাই, ঐ বাঙ্গালটার কীর্তি। মহর্ষিকে দারোয়ান সাজাইয়া কাঁধে লাঠি দিয়া ভগবানের দেউড়িতে দাঁড় করাইয়া রাখিল, তাঁর যেন ভগবানের বাড়িতে ঢুকিবার অধিকার নাই; আর ভগবানের সহিত তাঁর যেন সাক্ষাতই হয় নাই।' আবার দু' একজন বলিলেন, 'ওটা বাঙ্গাল অসভ্য, ওর কি কোন হিতাহিত জ্ঞান আছে, না কথা কহিতে জানে।' এইরূপ কথা শুনিয়া আমার প্রাণে বড় লাগিল, এদের ভিতরেও এরূপ অবজ্ঞার ভাব। পরস্পরকে এরূপ অবজ্ঞা করিয়া কথা কয়! আমি তখন মনে মনে স্থির কল্লুম আজ থেকে ব্রাহ্মসমাজের সংসর্গ ছাড়লুম। যদি ভগবান স্বয়ং প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া আমায় নেন, তবে ধর্মকর্মের কথা সব শুনবো। তারপর কত বছরের পর তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সহিত দেখা। ভাগিস্ তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাইত আমার মন ফিরলো, বুকে একটা শান্তি পেলুম, নইলে বুকটা জ্বলে যেত।" তারপর উৎসবসংক্রান্ত নানা বিষয়ে কথাবার্তা হতে লাগলো।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—যে দিন রাত্রে বলরামবাবুর ঘরে রামপ্রসাদী গান হইয়াছিল, মাষ্টারমশাই সেদিন রাত্রে তথায় উপস্থিত ছিলেন। গিরিশবাবু সেদিন মাষ্টার মশাইকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাড়িতে খাইতে গেলেন। গিরিশবাবু খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, "এ আনন্দের অন্ন—এ প্রেমের অন্ন।

সকল ভক্ত একত্রিত হইয়া খাওয়া মহা আনন্দের জিনিস," প্রকৃত তখন ভক্তমণ্ডলীর ভিতর পরস্পরের এরূপ ভালবাসা ছিল যে কোন্ দিন কে কোথায় আহার করিবে অনেক সময় তাহা স্থির থাকিত না। যে দেখা করিতে গেছে উপস্থিতমত কিছু খেয়ে এসেছে এরূপ অনেক সময়েই হইত। প্রত্যেক ভক্তের বাড়ি যেন নিজের বাড়ি, প্রত্যেক ভক্তের অন্ন যেন মহা পবিত্র অন্ন। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ কিছুই ছিল না —পরস্পরের ভিতর এরূপ একটা টান ছিল যে দু'তিন দিন দেখা না হইলে বড় কষ্ট হইত। ভক্তদিগের মধ্যে যে সব সময় বিশেষ কোন কথা হইত এরূপ নহে; কিন্তু সকলে একসঙ্গে বসিয়া থাকিতে বড় ভালবাসিত।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছা—এই সময় গিরিশবাবুর সাধনের ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি থিয়েটার ও সংসার একেবারে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে মনস্থ করিলেন। কেহ নিষেধ করিলে মানিতেন না অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে এসব বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে জানাইয়া তাঁহার মত লওয়া আবশ্যক। নরেন্দ্রনাথ তখন রাজপুতনায় ছিলেন। গিরিশবাবু তখন আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নরেন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লিখিলেন, নরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া গিরিশবাবুকে চিঠির উত্তর লিখিলেন যে, তাঁহার সন্ন্যাস লইবার কোন আবশ্যক হইবে না। তিনি সংসারে থাকিয়া তাঁহার কর্ম ও বহু কল্যাণকর কার্য করিতে পারিবেন। গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথের পত্রখানি পাইয়া প্রাণে শান্তি পাইলেন ও সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

স্বামী যোগানন্দ ও উপেন মুখোপাধ্যায়—ইংরাজি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গরমকালে বিকালবেলায় যোগেনমহারাজ ও বর্তমান লেখক বলরাম-বাবুর বাড়ির ছোট্ট ঘরটিতে বসিয়া আছেন, মাঝে একটি টেবিল। টেবিলের অপরদিকের বেঞ্চিটিতে যোগেনমহারাজ বসিয়া আছেন। বর্তমান লেখক টেবিলের দক্ষিণ দিকে একখানা চেয়ারে বসিয়া কথাবার্তা

কহিতেছেন। বেলা চারিটা বা সাড়ে চারিটার সময় উপেন মুখুজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্তমান লেখক চেয়ারখানি ছাড়িয়া যোগেনমহারাজের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং উপেন মুখুজ্যে চেয়ার-খানিতে বসিলেন। উপেন মুখুজ্যে আহ্লাদ করিয়া বলিলেন যে তিনি ১৩০০০ টাকা দিয়া একখানি বাড়ি কিনেছেন আর সেই সুখবরটি যোগেনমহারাজকে দিবার জন্য আসিয়াছেন। উপেন মুখুজ্যে যোগেন মহারাজকে গুরুর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, তাই আহ্লাদ করিয়া খবরটি দিতে আসিয়াছেন। যোগেনমহারাজ তাহা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। উপেন মুখুজ্যে বলিলেন, "আরও হাজার দুই টাকা বাড়িটি মেরামত করিতে লাগিবে। যোগেনমহারাজ বাবুরামমহারাজের মার কাছ থেকে চারটে বড় বড় পানতুয়া আনিয়া উপেন মুখুজ্যেকে খাইতে দিয়া এক গ্লাস জল ও একটা পান দিলেন। যোগেনমহারাজের প্রদত্ত জিনিস উপেন মুখুজ্যে অতি ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিয়া আহার করিতে লাগিলেন এবং নিতান্ত আপনার লোক জ্ঞানে যোগেনমহারাজের কাছে অনেক বিষয়ের পরামর্শ ও উপদেশ লইতে লাগিলেন। পরে তিনি চলিয়া গেলেন। যোগেনমহারাজ তখন হর্ষিত হইয়া সামনের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে কৌতুকচ্ছলে ডান হাতের তর্জনী নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, "দেখলি শ্যালা, আশীর্বাদ ফলে কি না? তুই শ্যালা ত আমায় মানবিনি, শ্যালা নিজের গোঁয়েতেই চলবি। দ্যাখ শ্যালা, উপেনের বটতলার ছোট দোকানটি থেকে এখন কেমন কল্লে। শ্যালা তবুও তুই আমায় মানবিনি?" যোগেনমহারাজ তখন খুব হর্ষিত হইয়াছিলেন সেইজন্য নানাভাবে হাসি ও কৌতুক করিতে লাগিলেন। তখনকার দিনে কাহারও কোন শুভ হইলে সকলেই আনন্দিত হইতেন এবং কাহারও কোন কষ্টতে সকলেই চিন্তান্বিত হইতেন। তখন ছিল এক মন এক প্রাণ।

স্বামী সারদানন্দ ও বর্তমান লেখক—১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শরৎমহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন। তখন তিনি অতিশয় ধীর ও নিতান্তই

বালকের স্বভাব হইয়াছিলেন সর্বদাই এমন কি রাত্রের অনেক সময় পর্যন্ত তিনি জপ ধ্যান লইয়া থাকিতেন এবং অধ্যয়নেও তদ্রূপ উৎসাহিত ছিলেন। অধীত নানা গ্রন্থের কথা তাঁহার মুখে সর্বদা লাগিয়া থাকিত। সকলের কি প্রকারে মঙ্গল হয়—সাধারণ জীবের কি করিলে মঙ্গল হয় এই চিন্তাই তিনি সর্বদা করিতেন এবং এই বিষয়েই সর্বদা কথা কহিতেন।

স্বামী সারদানন্দের Political Economyর আলোচনা—প্রাতে কখন কখন তিনি বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া বনহুগলির সুরম্য রাস্তাটিতে বেড়াইতে যাইতেন, কখন বা বাগানের ভিতরকার রাস্তাটি দিয়া বরাহনগর পর্যন্ত বেড়াইতেন। একবার Necessities of Life (জীবন ধারণের সামগ্রীর) এর কথা উঠিল, মানুষ কি পরিমাণে দ্রব্যাদি ভোগ করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে—কোন্ সব বস্তুকে বিলাসদ্রব্য বলা যাইতে পারে—আর কোন্ সব বস্তুকে আবশ্যকীয় বলা যাইতে পারে। এ সবই হচ্ছে Political Economyর কথা। উভয়েই নানারূপ কারণ দর্শাইতে লাগিলেন। অবশেষে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, জাতি বা সমাজের সভ্যতা, জল, বায়ু, স্থান ও অন্যান্য কারণের উপর আবশ্যকীয় ও বিলাসী দ্রব্য নির্ভর করে। কোন একটা নিয়ম করা যায় না। কোন স্থানবিভাগের রেখা টানিবার নয়। বহু কারণের উপর আবশ্যকীয় ও বিলাসী দ্রব্য নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণতঃ সমস্ত দ্রব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; শরৎমহারাজ Political Economyর গূঢ়তত্ত্ব লইয়া এই সমস্ত বিষয় অতি সুন্দরভাবে বিচার করিতেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইত।

একদিন শরৎমহারাজ বলিলেন, "চা-পান বিলাস-দ্রব্যের ভিতর, আবশ্যকীয় নহে।" উভয়েই চা-খোর। শরৎমহারাজের মুখে বিপরীত ভাব শুনিয়া বর্তমান লেখক বিস্মিত হইলেন। শরৎমহারাজ তখন আসামের চা বাগানের কুলিদিগের দুঃখ কষ্ট বলিতে লাগিলেন. "চায়ের জলটা কি জান? আসামের কুলিদের রক্ত। বিলাসের জন্য চা খাচ্ছ না?

আবশ্যকীয় বলিয়া যুক্তি তর্ক দিয়া সমর্থন করা নয়, ইহা প্রত্যক্ষ গরীব নিরাশ্রয় কুলিদিগের রক্ত।” শরৎমহারাজ এমন ওজস্বী এবং হৃদয়স্পর্শীভাবে কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া বর্তমান লেখকও ব্যথিত হইলেন। তিনি চা-বাগানের কুলিদিগের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে এমন ব্যথিত হইয়া পড়িলেন যে তাহার চক্ষে জল আসিল।

বর্তমান লেখকের চা পান ত্যাগ করা—বর্তমান লেখক বলিলেন, “চা বিলাসদ্রব্য হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত আবশ্যকীয়ও বটে।” যদিও বর্তমান লেখক ভীষণ চা-খোর কিন্তু সেই দিবসেই চা পান ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সর্বদাই তাহার চক্ষের উপর শরৎমহারাজের মুখ, জলপূর্ণ চক্ষুদ্বয় এবং অর্ধ ক্রন্দনস্বরে আদ্ গাদ্ শব্দ কয়েক দিবস ছিল। কিন্তু বর্তমান লেখক অতীব চা-খোর, দশ বার দিন চা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চা খাইতে লাগিলেন কিন্তু শরৎমহারাজের সেইদিনকার কথাগুলি ও ভাবভঙ্গি আজীবন তাঁহার স্মরণ আছে।

স্বামী সারদানন্দের কৌতুক রহস্য—কৌতুক রহস্যেও শরৎ মহারাজ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া মঠের দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন এমন সময় একটা গরু এক স্থান হইতে অপর এক স্থানে গিয়া শুইয়া রহিল। বর্তমান লেখক বলিলেন, “এই বৃষটা বাড়িরই হইবে কারণ এই স্থানটা ওর অভ্যস্তস্থান বলিয়া এইখানেই শুইয়া রহিল।” শরৎমহারাজ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “ঠিক বলেচ—এটা ঠিক মাতাল ও গুলিখোরের স্থান নির্ণয়। তবে এক গল্প বলি শোন,” এই বলিয়া তিনি এক গল্প বলিতে সুরু করিলেন, “দেখ দুই বন্ধু—এক মাতাল ও এক গুলিখোর রাস্তায় যাইতে যাইতে এক হালুইকরের দোকানে গিয়া খাবার কিনিল। হালুইকরের দোকানে তখন ভাঙ্গান পয়সা ছিল না, সেইজন্য ছয় আনা খাবার কিনিয়া দশ আনা পয়সা পরদিন আসিয়া লইবে স্থির করিল। উভয়ে খানিক দূর চলিয়া গেলে গুলিখোর বলিল, ‘ভাই, স্থানটি নির্ণয় করিয়া যাইতে

হইবে।' ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে একটা সাদা ষাঁড় দোকানের সামনে শুইয়া আছে। গুলিখোরটি বলিল 'ঠিক হয়েছে, একটা সাদা ষাঁড় শুয়ে থাকে, এই হল ঠিক চিহ্ন।' পরদিন সন্ধ্যার সময় উভয়ে নেশা করিয়া দশ আনা পয়সা আদায় করিতে আসিয়াছে ঘটনাক্রমে সাদা ষাঁড়টি এক লম্বা দাড়িওয়ালা দর্জির দোকানের সম্মুখে শুইয়া আছে, উভয়ে যাইয়া লম্বা দাড়িওয়ালা দর্জিকে তম্বিতম্বা—দশ আনা পয়সা দাও। দোকান ভুল হয় নাই, প্রমাণ ত ঠিকই রহিয়াছে কারণ সেই সাদা ষাঁড় সম্মুখে শুইয়া আছে। গুলিখোর বন্ধুটি বলিল, কি বাবা, দশগণ্ডা পয়সা ফাঁকি দেবার জন্য একেবারে ভোল ফিরিয়েছ ? কাল ছিলে হালুইকর আর আজ হলে দর্জি, আর বাবা রাতারাতি দাড়ি গজিয়ে ফেল্লে। এখনও তার সাক্ষী সাদা ষাঁড়টা শুয়ে রয়েছে—গুলি খাই বলে মনে করোনা বাবা আমার ভুল হয়েছে।" শরৎমহারাজ গল্পটি অভিনয়ের ভাবে এমন স্বর পরিবর্তন করিয়া উভয় বন্ধুর কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন যে বর্তমান লেখকের হাসিতে হাসিতে পেটে ব্যথা ধরিয়া গিয়াছিল। অপর সকলেও শরৎমহারাজের কথিত গল্পটি নকল করিয়া সকলকে হাসাইতে লাগিলেন।

শরৎমহারাজ গিরিশবাবুর কথিত আর একটি গল্প অভিনয়ের মত করিয়া সকলকে হাসাইতেন। কতকগুলি চাঁটগেঁয়ে মাঝি যাত্রা শুনিতে গিয়াছে। গানে সোম আসিলে সকলে এক সঙ্গে কি করে তাল দেয় ইহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না ; এইজন্য তাহারা তাহাদের সর্দারকে বলিল, "ও কত্থা (কর্তা), অই গানটা কেমন হইল ?" কত্থা বলিলেন, "যে সুমুন্দি চুম্ চুমাইছে উ সুমুন্দি মজা না মারছ্যা। যে সুমুন্দি ডেব ডোবাইছ্যা ও সুমুন্দিও মজা না মারছ্যা। যে সুমুন্দি প্যান প্যানাইছ্যা উই সুমুন্দিই মজা মারছ্যা। কহুর ভেতর গাড়ছে ম্যাক্ আর ম্যাকের গায়ে লাগাইছ্যা চিক। আর সব সুমুন্দি গুয়ে লাগাইছ্যো চিক্। চিক্ ধইরা মারে টান আর সব সুমুন্দি করে হঃ—হঃ—হঃ।"

শরৎমহারাজ যদিও স্বাভাবিক ধীর, গম্ভীর কিন্তু ইচ্ছা করিলে

নানারূপ কৌতুক ও ব্যঙ্গ করিয়া সকলকে খুব হাসাইতে পারিতেন। তাহার এইরূপ অনেক হাস্যোদ্দীপক গল্প ছিল, অনাবশ্যক বলিয়া এস্থানে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

সারদানন্দ স্বামীর অধ্যয়ন—এই সময় তিনি স্যার ওয়ালটার স্কটের নভেলগুলি খুব পড়িতেন এবং মাঝে মাঝে 'লেডী অফ দি লেক' হইতে উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। তখন তিনি যেন একটা ভাবরাজ্যে থাকিতেন, সর্বদাই বিভোর ও সকলের কাছে বিনয়ী, সকলের কাছে কৃপা প্রার্থী। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনস্রোত কোন্‌দিকে যাইবে তখন তিনি কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই এই সময় তাঁহার জীবনটা অতি মধুর ও ভালবাসাপূর্ণ ছিল।

অতুলচন্দ্র ঘোষ ও বর্তমান লেখক—বর্তমান লেখক অতিশয় চা খাইতেন তাহাতে বিষক্রিয়া হইয়াছিল। ভাগলপুর, গাজিপুর প্রভৃতি স্থানে গিয়া যদিও সুস্থ হইয়াছিলেন কিন্তু চা পান অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। একদিন প্রাতে লেখক গিরিশবাবুর বাড়িতে যান। অতুলবাবু বর্তমান লেখককে দেখিয়াই চা ত্যাগ করাইবার জন্য বাহিরের উঠানটিতে দাঁড়াইয়া অনেক ভৎ‍র্সনা ও গাল মন্দ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মনে করিলেন যে গিরিশবাবুর মুখ দিয়া খুব ভৎ‍র্সনা করাইবেন তাহা হইলে বর্তমান লেখক চা পান ত্যাগ করিবে। গিরিশবাবু তখন অতুলবাবুর নীচের বৈঠকখানাতে তক্তপোষের উপর দাঁড়াইয়া কাপড় পরিতেছিলেন। উঠানে হরেক রকমের লোক, তিনি শীঘ্রই কোথায় বাহিরে যাইবেন। অতুলবাবু বলিলেন, "দেখছো মেজদাদা, ছোঁড়ার চা খেয়ে মুখে রক্ত উঠেছে তবুও চা খাওয়া ছাড়বে না। তুমি একে ভাল করে একবার বকে দাও না।" বর্তমান লেখক নীরবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন বড় কাজীর কি ফতোয়া হয়। গিরিশবাবু ফরসা কাপড় খানির কসি গুঁজিতে গুঁজিতে অতুলবাবুকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ অতুল, তুমি নেশা ভাঙ্গ কর না, তুমি আমাদের কথা বোঝ না, আমরা নেশাখোর লোক, আমাদের থাক্ আলাদা; আমি

'মোদো' মাতাল—মহিন 'চেয়ো' মাতাল। আমাদের মাতালদেরও এক থাক্, তুমি ওবিষয়ে কিছু বুঝতে পারবে না!" বর্তমান লেখক দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অতুলবাবু গিরিশবাবুকে বলিলেন, "তুমি ত বল্লে, কোথায় ছোঁড়াকে ধমকাবে না উল্‌টো গাইলে। তা কে জানে বাপু তোমাদের মাতাল ফাতালের থাক্ তোমরাই বোঝগে যাও।"

ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায়—কালীবেদান্তীর পীড়ার সময় কাশীপুরের ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মভাবের লোক ছিলেন, কিন্তু শরৎমহারাজের সহিত কথা কহিয়া এইরূপ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আলমবাজারের মঠের সন্নিকটে আসিলেই মঠে আসিয়া সকলের সহিত দেখাশুনা করিয়া যাইতেন। তিনি অতি উদারস্বভাব ও পরহিতৈষী লোক ছিলেন এবং সকলের নিকট বিশেষ আপনার লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শীতকাল, সকালে বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, হাওয়াও চলিতেছে; বড় ঘরের সব দুয়ার জানালা বন্ধ। দুই তিন জন ভিতরে বসিয়া গায়ে সামান্য কাপড় দিয়া জপ করিতেছেন এমন সময় মতি ডাক্তার আসিয়া সহসা বড় ঘরটিতে ঢুকিলেন। সকল দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "লেপ কাপড় গায়ে দেওয়া চলে কিন্তু ঘর গায়ে দেওয়া ত কখনই দেখি নাই! দোরগুলি খুলে দিন।" তিনি এমন কৌতুকচ্ছলে কথাটি বলিয়াছিলেন যে সকলে ঐ কথাটি লইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

যোগানন্দ স্বামীর গ্রহণী রোগ—১৮৯২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে যোগেন মহারাজের গ্রহণী রোগ দেখা দিল। প্রথমে তাঁহাকে ইংরাজী ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করান হইয়াছিল, এবং তিনি দার্জিলিং-এ একবার বায়ু পরিবর্তন করিতেও গিয়াছিলেন। তাহার পর উত্তর পশ্চিমের দুই একটি স্থানে গিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসার অধীন রহিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না। তাঁহার শরীর ক্রমেই শীর্ণ হইতে লাগিল এবং পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আহার বিশেষ

নিয়মিতভাবে থাকিলে পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইত, পথ্যাপথ্যের কোন ব্যতিক্রম হইলেই পীড়া বৃদ্ধি পাইত কিন্তু তাঁহার মানসিকবৃত্তি তাহাতে কোন প্রকারে ব্যতিক্রম হয় নাই। সেই হাস্য মুখ, সেই অমায়িক ভাব, সেই সকলের জন্য মঙ্গল চিন্তা করা। নিজের শরীরের পীড়াকে গ্রাহ্যের ভিতর আনিতেন না। এই পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অবশেষে ইহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল।

সারদানন্দস্বামী ও হরিশ—আলমবাজারের মঠে বর্ষাকালে বিকালে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। শরৎ মহারাজ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন তাই আক্ষেপ করিয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানের নানাকথা কহিতেছিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিরা কি উপায়ে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "বাঙ্গলা দেশ একেবারে ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের কোন স্থানে গিয়া মঠ স্থাপন করিলে ম্যালেরিয়ার আর ভয় থাকিবে না।" অপর একজন বলিলেন, "তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) বাংলা দেশে থাকিয়া তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, পচা ম্যালেরিয়ায়, দক্ষিণেশ্বরে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, বাংলা ত্যাগ করিয়া যাওয়া হইতে পারে না।" এইরূপ নানা বিষয় কথাবার্তা হইতেছে। হরিশ, যিনি দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে ছিল এবং মাথার একটু গোল হওয়াতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল, তখন উপস্থিত ছিল। হরিশ চুপ করিয়া ম্যালেরিয়ার কথা শুনিতেছিল। শরৎমহারাজ হরিশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই হরিশ, আর তো এমন করে চলা যায় না। সকলেই তখন বারবাড়ির সিঁড়ির সামনে পশ্চিমদিকের দালানটিতে বসিয়াছিলেন এবং পশ্চিমদিকের জানালা দিয়া পড়ন্ত রোদ আসিতেছিল। হরিশ ভক্তিভাবে করমর্দন করিতে করিতে শরৎমহারাজকে বলিল, "তা-তা-তা ভাই ও রকম করে চল্ চল্ চল্লে যদি ব্যামো হয়, তবে এমন করে চল্লে হয় না", এই বলিয়া পদদ্বয় উচ্চে তুলিয়া হস্তদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল, ঊর্ধ্বপদে ভ্রমণ, যাহাকে 'পিকক্ মার্চ'

বলে, হরিশ তদ্রূপ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সকলে তাহা দেখিয়া হাসিতে লাগিল কিন্তু তাহার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন কোন ব্যক্তি তার পা দুটো ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। হরিশ দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "কেন, শরৎ এই যে বল্লে পায়ে চল্লে ম্যালেরিয়া হয় তাই আমি হাতে চলছিলুম।" সকলে তাহা শুনিয়া আরও হাস্য করিতে লাগিলেন। বোঝা গেল তার তখনও অপ্রকৃতিস্থ ভাব আছে।

মুট্‌কু—সতীশচন্দ্র দত্ত এই সময়ে আলমবাজারের মঠে খুব যাতায়াত করিতে লাগিল। তখন তাহার নিবাসস্থান গড়পারে ছিল এবং হুট্‌কো গোপালের প্রতিবাসী হওয়ায় তার বিশেষ বন্ধু ছিল। সতীশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের গৃহী শিষ্য বলিয়া পরিচিতও হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ আহ্লাদ করিয়া তাহাকে 'মুট্‌কু' নাম দিয়াছিলেন। এইজন্য অদ্যাপিও তিনি 'মুট্‌কু' নামে অভিহিত হন। তিনি আলমবাজারের মঠে যাইয়া সকলের সেবা করিতেন, এইজন্য সকলের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

লাটু মহারাজের শিবপূজা—১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শিবরাত্রিতে লাটু-মহারাজ আলমবাজারের মঠে চার প্রহর শিবপূজা করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলেন এবং তাঁহার সহিতও দু'চার জন ছিল কিন্তু সকলে নয়। লাটু মহারাজ 'হর হর মহাদেব' বলিয়া চীৎকার করাতে বাড়ি কাঁপিয়া গিয়াছিল। প্রভাতে যখন শিবপূজা সমাপ্ত হইয়াছে এবং গঙ্গামৃত্তিকার শিবগুলি বিল্বপত্র সমেত বাহিরে বাহির করিয়া রাখা হইয়াছে তখন কালীবেদান্তী ঈষৎ কৌতুকচ্ছলে বর্তমান লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন হে! দেখছো লাটু কেমন সমস্ত রাত্রি শিবপূজা করেছে!' বর্তমান লেখক গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করে—ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করে না" (Man creates God and not God creates man)। "তুমি যে বড় ফিলোজফার হয়েছ, একেবারেই যে অদ্বৈতবাদী। পূজাও কিছু কিছু আবশ্যক।" এই বলিয়া কালীবেদান্তী হাস্য করিতে

লাগিলেন। কারণ তখন তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তাঁহার মত কথা বলায় তিনি তাই অত হাস্য কৌতুক করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বিপিন চন্দ্র ঘোষ—ডাক্তার বিপিন চন্দ্র ঘোষ বাবুরাম-মহারাজের খুড়তুতো ভাই এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত। তিনি সর্বদা বলরামবাবুর বাড়ি যাইতেন এবং তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের চিকিৎসা করিতেন। তখন তিনি নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়দের চিকিৎসা করিতে বা অন্যান্য কারণেও সর্বদা দেখিতে যাইতেন এবং যোগেনমহারাজের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ও মেশামেশি ছিল, সেইজন্য তিনি ভক্তমণ্ডলীর ডাক্তার বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

কালীবেদান্তীর এক সময় বরফি তৈয়ারি করিতে খেয়াল উঠিল। তিনি নানা পরিশ্রম করিয়া কড়ায় বরফির থাস করিয়া থালায় ঢালিয়া দিলেন এবং সুখাইয়া বরফি তৈয়ার করিবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু কার্যে অনভ্যস্ত হওয়ায় তাঁহার বরফি দোকানের মত উৎকৃষ্ট হইল না। কিন্তু অধ্যবসায়ী ব্যক্তি নিরুদ্যম হইবার নয়, এইটি তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পুনরায় বরফি তৈয়ার করিতে লাগিলেন অবশেষে কৃতকার্যও হইলেন। সাদা কুমড়ার বরফি, আমলকির মোরব্বা প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার দিনকতক মোরব্বা করিবার খুব খেয়াল উঠিয়াছিল।

শশীমহারাজ, শরৎমহারাজ এবং আরও কেহ কেহ কড়ায়ের ডাল খাইতে ভালবাসিতেন, এইজন্য মাঝে মাঝে কড়ায়ের ডাল হইত। কালীবেদান্তীর কিন্তু কড়ায়ের ডালে মহা বিরক্তি। কড়ায়ের ডালের নাম শুনলেই তাঁহায় সর্দি উপস্থিত হইত এবং হাঁচিতে সুরু করিতেন। এইজন্য অনেকে কড়ায়ের ডাল লইয়া তাঁহার সহিত কৌতুক করিতেন।

আলমবাজার মঠে ভূতের ভয়—আলমবাজারের যে বাড়িটি মঠের জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল, সেই বাড়ির নীচের ঘরে আত্মহত্যা হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তিরা বাহিরের বড় ঘরের নীচেকার এঁদো ঘরের

দেওয়ালে কয়লা দিয়া শেষ বিদায় লিখিয়া গিয়াছিল। বাড়িটিতে মঠ হইলে সেই স্থানটি কলি ফিরাইয়া মুছিয়া ফেলা হয়। সাধারণ লোকে উহাকে ভূতের বাড়ি বলিত, এইজন্য অল্প মূল্যেই বাড়িটি ভাড়া পাওয়া গিয়াছিল। বাড়িটিতে মঠ হইলেও প্রথম কয়েক মাস সন্ধ্যার সময় লোকে যাইতে ভয় করিত এবং দিনের বেলা সকলে জটলা করিয়া বলিত, "এখন বাড়িটিতে হরিনাম হইতেছে আর ভূতের ভয় থাকবে না" কিন্তু রাত্রে অন্ধকার হইলেই সকলের আবার ভূতের ভয় হইত।

সদানন্দ স্বামীর অনেককে ভুতের ভয় দেখান—একদিন গরম-কালে বৈকালবেলা বর্তমান লেখক "রেলির থান" পরিয়া গিয়াছিলেন, ঘর্মে কাপড়খানি সিক্ত হওয়ায় সিঁড়ির পশ্চিমদিকের দেওয়ালে যে জানালাটি ছিল, তাহার গরাদে কাপড়খানি বাঁধিয়া রাস্তার দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু কাপড়খানি শুকাইবার জন্য—কিন্তু রাত্রে কাপড়খানি তুলিতে ভুল হইয়াছিল। রাত্রিতে চাঁদের আলো ছিল, কাপড়খানি হাওয়ায় উড়িতেছিল তাহাতে রাস্তার লোক ও প্রতিবাসীরা ভূত বাহির হইয়াছে বিবেচনা করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়াছিল। তাহার পরদিন এক বৃদ্ধ সন্ধ্যার পূর্বে আসিয়া ঘরটিতে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ ভূত দেখিয়াছেন এইরূপ অলৌকিক গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার সৌজন্য ও হিতৈষীরভাব দেখিয়া কেহই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে পারিলেন না। গুপ্তমহারাজ, শরৎমহারাজ ও বর্তমান লেখক ধীরে ধীরে চা পান করিতে লাগিলেন এবং ভূতের অলৌকিক গল্প শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল, বৃদ্ধটি নিজের ভূতের গল্পে নিজেই এত অবিভূত হইয়া-ছিলেন যে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে তাঁহার আর সাহস হইল না। অবশেষে তিনি গুপ্তমহারাজকে লণ্ঠন ধরিয়া পৌছাইয়া দিয়া আসিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। গুপ্তমহারাজের বয়স অল্প ও তিনি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, হারিকেন লণ্ঠনটি লইয়া তাঁহাকে সিঁড়ি দিয়া

অর্ধেকটা নামাইয়া ফস্ করিয়া হারিকেন লণ্ঠনটি নিবাইয়া দিলেন এবং দ্রুতপদে উপরকার ঘরে চলিয়া আসিয়াই দরজাটিতে শিকল দিয়া দিলেন। বৃদ্ধটি ভয়ে "বাপরে, মারে, ভূতে ধরলেরে" বলিয়া ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে সিঁড়িতে বসিয়া ক্রন্দন স্বুরু করিলেন, তাহাতেও কেহ ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। অগত্যা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় পড়িয়া প্রাণভয়ে চোঁচা দৌড় দিলেন। পাড়ায় গিয়া তিনি কত রকম নূতন ভূতের গল্প তৈয়ারি করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়। কিন্তু তাহারপর হইতে তিনি আর আলমবাজারের মঠে ঢুকিতেন না। ভূতের গল্প লইয়া দিনকতক খুব হাসি তামাসা চলিয়াছিল।

সকলের পরিব্রাজক অবস্থায় নানাস্থানে ভ্রমণ—পূর্বে কথিত হইয়াছে যে গঙ্গাধরমহারাজ নরেন্দ্রনাথকে লইয়া উত্তর পশ্চিমে চলিয়া যান। তিনি আলমোড়া প্রভৃতি অনেক স্থানে একসঙ্গে ছিলেন। হরিমহারাজ, রাখালমহারাজ, শরৎমহারাজ ও সান্যাল মহাশয়—ইঁহারা অনেক স্থানেই একসঙ্গে ছিলেন। অবশেষে মীরাটে আসিয়া সকলে উপস্থিত হন। মীরাটে কয়েক মাস থাকিয়া সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিয়া যান। শরৎমহারাজ বরাহনগরের মঠে প্রথম ফিরিয়া আসেন। হরিমহারাজ আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসেন। গঙ্গাধরমহারাজ প্রথম রাজপুতনায় চলিয়া যান, তাহার পর তুলসী-মহারাজ ও কালীবেদান্তী যাইয়া গঙ্গাধরমহারাজকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। এই সময়কার ঘটনাবলী ঠিক স্মরণ নাই। কারণ সকলেই তখন পরিব্রাজক, কে কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন এবং কাহার সঙ্গে কে গেলেন তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। এইসব বিষয়গুলি পরে যে এত মধুর ও প্রীতিপ্রদ হইবে তাহাও তখন কেহ বিবেচনা করেন নাই। সামান্য পর্যটকের বিবরণ, কেইবা আর স্মরণ রাখিয়াছিল! তবে অস্পষ্টভাবে যাহা কিছু স্মরণ আছে তাহাই সন্নিবেশিত হইল।

অখণ্ডানন্দ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত—গঙ্গাধরমহারাজ আলমবাজারের

মঠে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি কেবল রাজপুতনার আর তিব্বতের কথাবার্তা কহিতেন। দিবারাত্রই ভ্রমণের কথা চলিতেছিল। অবশেষে মঠের লোকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কালীবেদান্তী কৌতুকচ্ছলে বালকস্বভাব গঙ্গাধরমহারাজকে নানারূপ ব্যঙ্গ ও পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি আলমবাজারের মঠ ত্যাগ করিয়া বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ি বা অন্যস্থানে থাকিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম গঙ্গাধর এইজন্য গিরিশবাবু আদর করিয়া তাঁহাকে "গ্যাঞ্জেস', (Ganges) বলিয়া ডাকিতেন এবং লাটুমহারাজ তাঁহাকে "গোঞ্জিস" বলিয়া ডাকিতেন। বাগবাজারের প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত গঙ্গাধর-মহারাজের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। প্রিয় মুখুজ্যে বলরামবাবুর বাড়িতে বসিয়া তাহাকে একটা গল্পে লাগাইয়া দিতেন। গঙ্গাধরমহারাজ এমন হাস্যকৌতুক এবং মুখভঙ্গি ও চক্ষুদ্বয় বিকৃত করিয়া গল্প বলিতে পারিতেন যে দুই ঘণ্টা কাল বলিলেও তাঁহার ক্লান্তি হইত না। তাঁহার রাজপুতনা ও তিব্বতের গল্প সারগর্ভ, দুঃখের বিষয় তাহা তিনি সম্পূর্ণ লিখিয়া রাখেন নাই।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের, জনৈক মুসলমান ফকিরের গল্প বলা— গিরিশবাবু একটি মুসলমান ফকিরের গল্প অনেকবার বলিয়াছিলেন, গল্পটি অতি সারগর্ভ হওয়ায় এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। কোনদেশে একটা গ্রামে একটা পাগল ফকির থাকিত। সে পাগড়ির পরিবর্তে মাথায় একগাছা খড় জড়িয়ে রাখত, গায়ে কোন বস্ত্র থাকত না, পরিধানে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। সে প্রায়ই গ্রামের জল যাইবার সেতুর উপর বসিয়া কেবল মাথা দুলাইত। সেই গ্রামে ও তৎসন্নিকটস্থ অপর সকল গ্রামে যাইবার সেইটিই প্রশস্ত পথ। পাগলা সাঁকোর উপরে বসিয়া উভয় পার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত দেখিতে পাইত। যখন দেখিত দূর হইতে কোন বিদেশী আসিতেছে তখন সে দ্রুতপদে তাহার কাছে গিয়া আগন্তুক ব্যক্তির পুঁটুলিটি নিজের মাথায় লইত এবং তাহাকে গ্রামে আনয়ন করিয়া থাকিবার ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিত।

পরে সেই আগন্তুক ব্যক্তি গ্রামান্তরে যাইবার ইচ্ছা করিলে তাহার পুঁটুলি ও দ্রব্যাদি লইয়া গন্তব্য গ্রামে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিত। কোন ব্যক্তির অসুখ করিলে পাগলা সমস্ত রাত্রি তাহার সেবা করিত এবং বিধিমত নানা প্রকারে চেষ্টা করিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার প্রয়াস পাইত। পাগলার আহারের কোন নিশ্চয়তা ছিল না এবং তাহার কোন নির্দিষ্ট গৃহ ছিল না। পাগলা বলিয়া লোকে দয়া করিয়া তাহাকে কিছু খাইতে দিত। সেই গ্রামে এক মোল্লা ছিল। সে বিশেষভাবে মুসলমান-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিল এবং মুসলমানধর্ম অনুযায়ী পাঁচবার নামাজ ও অপর সকল নিত্যনৈমিত্তিক কার্য করিত। জনসমাজে মোল্লার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। মোল্লা পাগলকে নামাজ করিতে ও রোজা রাখিতে বলিত, পাগলা কিন্তু তাহার কিছুই করিত না। অধিকন্তু ভগবানের নাম শুনিলে পাগলা দু'শ বার গাল পাড়িত। মোল্লা তাহার উপর রুষ্ট থাকিত এবং গ্রামস্থ লোকদিগকে পাগলাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য বলিত। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এবিষয়ে কর্ণপাত করিত না। সকলেই পাগলাকে লইয়া হাসিত ও আমোদ করিত।

পাগল, দেবদূত ও মোল্লা—কয়েক বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে ঘটনাক্রমে একবার দেবদূত "অদৃষ্ট-গ্রন্থ" হাতে লইয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের সকলেই পরলোকে কার কি অবস্থা হইবে জানিবার জন্য দেবদূতের কাছে গেল ও আপন আপন অবস্থা জানিয়া আসিল। মোল্লা ব্যঙ্গচ্ছলে দেবদূতকে বলিল, "মশাই, এই পাগলা কখন নামাজও পড়ে না, রোজাও রাখে না, আর আল্লার নামে গাল পাড়ে। দেখুন দেখি এ কোন্ নরকে যাবে?" দেবদূত মোল্লার কথা-মত পুস্তকের নরকখণ্ড খুঁজিতে লাগিল এবং নরকখণ্ডের কোন স্থানে পাগলের নাম উল্লেখ পাইল না। মোল্লা হর্ষিত হইয়া বলিল, "লোকটা এত পাপিষ্ঠ যে নরকেতেও উহার নাম নাই।" তখন সকলে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত ও সবিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক হইল। পুনরায় তাহারা

দেবদূতকে বলিল, "মহাত্মন্! দেখুন দেখি আপনার পুস্তকের অপর অংশে আছে কি না?" দেবদূত বলিলেন, "অপর অংশ স্বর্গখণ্ড।" "আচ্ছা এ পাগলার কি স্বর্গখণ্ডে নাম থাকতে পারে?" দেবদূত বলিলেন, "মর্তে জন্ম হইলে জীবের কার্য বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিত থাকিবেই থাকিবে, ইহার কোন অন্যথা নাই।" এই বলিয়া তিনি স্বর্গখণ্ড দেখিতে লাগিলেন। স্বর্গের প্রথম খণ্ডে পাগলের নামের কোন উল্লেখ নাই, সর্বশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ সপ্তম স্বর্গ দেখিতে লাগিলেন। সপ্তম স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানে পাগলের নাম দেখিলেন এবং তথায় লিখিত আছে যে একদিন এক শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ গ্রামে আসে, প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা; পাগলা তাহাকে স্থান ও আহারাদি দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। মুমূর্ষু বৃদ্ধ সুস্থ হইয়া পাগলাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিল। আর একটি অনাথ বালক—তাহার কেহই ছিল না, পাগলা তাহার থাকিবার ও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল, পরে সে কৃতবিদ্য হইয়াছিল। পাগলা অনেক রোগীর শুশ্রূষা এবং বিপন্ন ব্যক্তির জন্য শারীরিক পরিশ্রম করিয়াছিল। পারিতোষিক ও প্রত্যুপকারের কথা তাহার মনে উঠিত না। এই সকল অপ্রকাশিত সৎকর্মের জন্য শ্রেষ্ঠ স্থানে গতি হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই-ত পাগলকে লইয়া বিশেষ আনন্দ করিতে লাগিল কিন্তু পাগলা দেবদূত সম্মুখে আল্লার নামে গালি পাড়িতে পাড়িতে মাথার ঝাঁকড়া চুলে একগাছা খড় বাঁধিয়া মাথা হেলাইতে দোলাইতে পথের উভয় দিকে খর দৃষ্টি করিতে লাগিল। কোন শ্রান্ত বিদেশী সেই গ্রামে আসিতেছে কিনা এবং আসিলে তাহার সে কিছু সেবা করিতে পাইবে এইটি ভাবিতে লাগিল ও বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল।

সকলেই দেবদূতকে অনুনয় করিতে লাগিল, "মহাত্মন্! আমাদের এই মোল্লা দেহত্যাগের পর কোন্ স্বর্গে যাইবেন? দেবদূত সপ্তম স্বর্গে দেখিলেন তাহাতে তাঁহার নাম নাই। ক্রমে ক্রমে একে একে নীচু স্বর্গ দেখিলেন, কুত্রাপি তাঁহার নাম দেখিলেন না। তাহারপর

বদূত নরক খণ্ড দেখিতে লাগিলেন এবং প্রথম হইতে পর্যায়ক্রমে
ম্নস্তর নরক দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে সর্বনিম্ন নরকে মোল্লার
ম দেখিয়া সকলেই অবাক ও বিস্ময়ান্বিত হইল। তাহাতে লেখা
াছে "মোল্লা একটি পিতৃহীন বালকের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ
রিয়াছে, একটি গরীব বিধবার উপজীবিকাস্বরূপ একটি দুগ্ধবতী গাভী
ল, মোল্লা সেটিও আত্মসাৎ করিয়াছিল। জেকাত বা উদ্বৃত্ত আয়ের
তকরা পাঁচ টাকা হিসাবে যাহা ধর্মার্থে প্রদত্ত হয়, সেই জেকাত,
ংপীড়ন করিয়া অনেক অর্থ গ্রহণ করিয়াছে; এইজন্য মোল্লার নিম্নস্তর
রকে বাস হইবে। গ্রামস্থ উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলে আশ্চর্যান্বিত
ইয়া যে যার নিজের গৃহে চলিয়া গেল। গিরিশবাবু গল্পটি
দয়ভাবে অভিনয়স্থলে এমন বলিতেন যে তাহাতে শ্রোতার হৃদয়
পর্শ করিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আগমন
-একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরামবাবুর বাড়িতে আসিয়াছিলেন,
থায় অপরাহ্ন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পর যোগেনমহারাজ
অপর দু'একজনকে সঙ্গে লইয়া গিরিশবাবুর বাড়ি গেলেন। গিরিশ-
াবু সম্ভবতঃ একটু রং-এ ছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়াই
ানন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন। কি করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি করিবেন,
চ করিয়া আদর-যত্ন করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া
াকেবারে এলোমেলো হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার চাকর ইশ্‌নেকে
জার হইতে লুচি ও আলুর দম আনিতে বলিলেন, এবং প্রত্যহ
য কাঁসার থালায় খাইতেন সেই থালাখানি আনিতে বলিলেন।
বঠকখানার ঘরে তোষক পাতা; তার উপর লম্বা জাজিম, তাহার
পর গিরিশবাবু কাঁসার থালায় লুচি ও আলুর দম রাখিলেন।
াজিমের উপর সকলে বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ
পরের ব্যবহৃত থালা ও অপরিষ্কৃত স্থানে খাইতে দ্বিধাবোধ করিয়া-
ছিলেন, গিরিশবাবু তখন একটু গোলাপী অবস্থায় ছিলেন, অমনি বলিয়া

উঠিলেন, "কেন বলরামের বাড়িতে খেতে পারেন আর এখানে খে
যত আপত্তি?"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবর শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে আহা করা—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশবাবুর এইরূপ অকপট ভালবাসা ও শুচি অশুচি ভাবের কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই দেখিয়া প্রীত হইয় লুচি ও আলুর দম খাইতে লাগিলেন এবং মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন গিরিশবাবু তখন ঈশ্‌নে চাকরকে বলিলেন, "দ্যাখ্ দিকিনি সকা পুঁইশাক ও চিংড়ি মাছের চচ্চড়ি হয়েছিল, সেটা খেতে বড় ভা হয়েছিল—থাকে যদি নিয়ে আয়।" ঈশ্‌নে চাকর একটা পাত্র কর সকালকার পুঁইশাক চচ্চড়ি রান্নাঘর থেকে লইয়া আসিল ও শ্রীশ্রীরাম কৃষ্ণদেবের থালায় ঢালিয়া দিল। যিনি অপর কেহ স্পর্শ বা কো প্রকার অশুচি হইলে আহার্য জিনিস খাইতে পারিতেন না, তিনি কো দ্বিধা না করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে পুঁইশাক চচ্চড়ি ও লুচি খাইতে লাগিলেন। যোগেনমহারাজ প্রভৃতি এই সমস্ত ব্যাপা দেখিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীরামেকৃষ্ণদেব ভক্তগণের প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "বলরামের কাছে বলরামের ভাব, গিরিশের কাছে গিরিশের ভাব।" গিরিশবাবুর কি অকপট সরল ভালবাসা ছিল তাহারই এইটি উদাহরণ,—সে ভাব শুচি অশুচির অতীত অবস্থা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ক্রমশঃ গিরিশ বাবুর শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি ভা বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিতে লাগিলেন, "আপনা আমার ছেলে হয়ে জন্মাতে হবে। সামান্য একটু খাইয়ে দুটো কথা কয়ে আমার ভালবাসা বা আনন্দ পরিপূর্ণ হচ্ছে না। ছেলে হয়ে জন্মালে আমি সর্বদা কোলে নিয়ে বুকে নিয়ে রাখবো।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হাস্যচ্ছলে একটু মৃদু ভৎসনা করিয়া বলিলেন, "যা, তোর ছেলে হব কেন? তুই মোদো—আবার বুঝি তোর পচা দেহের ভিতর দিয়ে

আস্‌বো ? আমি তা পারব না। আমার বাপ ঋষি ছিল তাই তাঁর দেহের ভিতর দিয়ে এসেছিলুম।" এইরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা ও আনন্দপূর্ণ কথাবার্তার পর শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগেনমহারাজ ও নিরঞ্জনমহারাজ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বলরামবাবুর বাড়িতে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্টার থিয়েটারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ— একদিন যোগেনমহারাজ ও বর্তমান লেখক গিরিশবাবুর বাড়িতে গেলেন। গিরিশবাবু ও বর্তমান লেখক চা পান করিবার পর গিরিশবাবু যোগেনমহারাজকে দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হ্যাঁরে যোগে, সেই ষ্টার থিয়েটারে লুচি খাওয়াটা কি হয়েছিল বলতো ?" যোগেনমহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "দূর শ্যালা, তুই তখন মাতাল হয়েছিলি, তোকে দেখে আমার প্রাণ আঁৎকে গেছ্‌লো। শ্যালা, আমি সাবর্ণ চৌধুরীর বাড়ির ছেলে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের বাড়িতে খাইনে, তুই কিনা সেদিন আমায় থিয়েটারে বসে লুচি খাওয়ালি! সেদিন আমার তুই জাত মেরে দিয়েছিলি।" গিরিশবাবুর পূর্ব কথা স্মরণ হওয়ায় খুব আনন্দ করিতে লাগিলেন ও পরে নিজেই বলিলেন, "গ্যাখ্‌ একদিন বিকেল বেলা ষ্টার থিয়েটারে ষ্টেজে বসিয়া আছি, অভিনেতৃগণ আশেপাশে বসিয়া সকলেই হাসি-কৌতুক করিতেছে। চৈতন্যলীলা তখন দু'একবার অভিনয় হইয়াছে। এমন সময় ষ্টেজের উপর একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসমশাই চৈতন্যলীলা দেখিতে আসিবেন।' তখন আমি চৈতন্যলীলা লিখেছি,—খুব নাম বেরিয়েছে, খুব অহঙ্কারও ভেতরে। আমি বল্লুম, 'পরমহংস মহাশয়ের টিকিট লাগবে না—আর সকলের টিকিটের দাম লাগবে।' সকলে সন্ধ্যার সময় অভিনয় দেখিতে আসিলেন। অভিনয় সমাপ্ত হইলে আমি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত দেখা করিবার জন্য উপরে বসিবার স্থানে গেলাম। তিনি প্রীত হইয়া আমায় বলিলেন, 'এইবার তোমার পর্দা উঠে যাবে অর্থাৎ অভিনয়ের বিরামে ও প্রারম্ভে যেমন পর্দা উঠে যায় এবং

নূতন প্রকার দৃশ্য দর্শকদের সামনে প্রকাশ হয়, মনের আবরণী পর্দাও সেইরূপ উঠে যাবে ' তখন মাল টানিয়া ছিলাম, কথাটার মর্ম বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ভিতরে যেন একটা আশ্বাস ও আনন্দ উঠিতে লাগিল—এলোমেলো অবস্থা। সামাজিকতা হিসাবে সাধু ও অভ্যাগত আসিলে কিছু মিষ্টিমুখ করাইতে হয়। নূতন ভাবে প্রবোধিত হইয়া বাজার হইতে লুচি তরকারি ও কিছু মিষ্টি আনাইয়া সকলকে খাইতে বলিলাম।" গিরিশবাবু এই বিষয়টি এত উত্তেজিত হইয়া ও অভিনয় ভাবে বলিতে লাগিলেন যে প্রত্যেক কথাটি স্মরণ রাখা সম্ভবপর নয়, এইজন্য মর্মার্থ দেওয়া হইল, কারণ সেইরূপ প্রাঞ্জল ভাষা অপরের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সকলে একটু একটু লুচি ও মিষ্টি খাইল। যোগেন-মহারাজ অপরের স্পর্শিত বিশেষতঃ থিয়েটারের স্থলে খাইতে সঙ্কোচ করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু তখন বিস্ফারিত নেত্রে আহ্লাদ ও গাম্ভীর্য মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তুমি কেন খাচ্ছ না হে? খেয়ে নাও।" গিরিশবাবুর সেই বিরূপাক্ষ নেত্র ও জগাই মাধাইয়ের ভাব দেখিয়া যুবক যোগেনমহারাজ ভয়ে ত্রস্ত হইয়া একবার লুচি খাইতে লাগিলেন ও একবার গিরিশবাবুর দিকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু লুচি চিবাইয়া খাইতে অবসর পাইলেন না, কোঁৎ কোঁৎ করিয়া গিলিয়া খাইতে লাগিলেন। গিরিশবাবু এইসময় একটু কৌতুক করিয়া যোগেন-মহারাজকে বলিলেন, "কিরে যোগে, তুই লুচিটা কি করে খেতে লাগলি?" যোগেন মহারাজ বলিলেন, "আমার খালি ভয় হতে লাগলো পাছে তুই কামড়ে দিস! তুই শ্যালা যেই হাঁ করতে লাগলি; আর মুখ দিয়ে যে ভর ভর করে মদের গন্ধ বেরুতে লাগলো, আমি লুচি মুখে দিয়েছি কি চোখে দিয়েছি তা বুঝতে পারিনি—শুধু একবার তোর মুখের দিকে চেয়েছি আর কখন পাতাটা খালি হয় তাই দেখেছি।" এই সব কথার পর গিরিশবাবু অতি আনন্দিত হইয়া খানিকক্ষণ খুব হাসিলেন, তারপর তিনি একেবারে স্থির ও গম্ভীর হইয়া রহিলেন যেন ভিতরে কিছু গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ—ইটালির দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় তখন গিরিশবাবুর কাছে লেখকের কার্য করিতেন। গিরিশবাবুর অনেক গ্রন্থই তাঁহার হস্তে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন অভিনয় দেখিতে যান। সম্ভবতঃ পূর্বকথিত যোগেনমহারাজকে লুচি খাওয়ান সেই একই উপাখ্যান হইবে, আমার ঠিক স্মরণ না থাকায় উপাখ্যানটি আমি দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। দেবেনবাবু বলিতে লাগিলেন, "অভিনয়ের পর গিরিশবাবু খুব মাল টানিয়াছেন এবং পরমহংস মহাশয়কে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছিলেন কিন্তু কি বলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইবেন তাহা কিছু ঠিক করিতে পারেন নাই, সেইজন্য মুখে যা এসেছে গাল দিয়া স্তবস্তুতি করিয়াছেন—উদ্দেশ্য প্রগাঢ় ভক্তি, ভাষা—রূঢ় ও অশ্রাব্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে এরূপ পরুষ ভাষায় স্তবস্তুতি করিবার পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। পরদিন পরমহংসদেব একটু উত্তেজিত হইয়া অনবরত ঘরের বারান্দার সম্মুখেতে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'এ শ্যালা কোন থাকের ভক্ত? আমার বাপ ঋষি-তপস্বী ছিলেন, আমার বাপকে গালি দিলে?'

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার—"পরদিন গিরিশবাবু স্নান আহার কিছুই করেন নাই, একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ মেঘলা—তিনি বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন ও মাঝে মাঝে চোখের জল পড়িতেছে। দেবেনবাবু বুঝাইতে লাগিলেন, 'তুমি মদ খেলে কি যে হও তা বলা যায় না; তোমার মুখের দৌড় থাকে না,—তোমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। তোমার একেবারে জিভের বাঁধন থাকে না। যাকে যা বলবার নয় তাই বল। চল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাঁর কাছে মাপ চাইবে চল।' গিরিশবাবু জিদ্ করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের দিকে মাঝে মাঝে তাকাইতে লাগিলেন। দেবেনবাবুর কথা শুনিয়া গিরিশবাবু বলিলেন, 'বলে বেশ করেছি,

আমার ভিতর যে ভাব উঠেছিল আমি তাই বলেছি, আমি অত ভাষা বুঝিনি। আর তুমি বলছো যে তাঁর কাছে মাপ চাইতে, তা হতে পারে না। সে শ্যালা যদি অন্তর্যামী হয়, তাহলে কি সে বুঝতে পাচ্ছে না যে আমি সারাদিন নাইনি খাইনি, বসে বসে কাঁদছি? সে শ্যালা যদি এইখানে এসে আমায় সান্ত্বনা করে তাহলে আমি খাব, নইলে শুকিয়ে প্রাণত্যাগ করব।' এমন দৃঢ়তর নির্ভরের সহিত গিরিশবাবু এই কথাগুলি বলিলেন যে, দেবেনবাবু আর প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। উভয়ে বসিয়া এই সব কথাবার্তা কহিতেছেন এমন সময় দেখিলেন গলির মোড়ে ছ্যাকড়া গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। গিরিশবাবু গলির দিকে চাহিয়া দেখেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ত্বরিতপদে গিরিশবাবুর বাড়ির দিকে আসিতেছেন। তাহা দেখিয়া গিরিশবাবুর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যতই বলিতে লাগিলেন, 'গিরিশ শ্যালা মাতাল, আমার বাপকে গাল দিল, ও শ্যালা কোন্ থাকের ভক্ত' ইত্যাদি ততই তাঁহার ভাবান্তর হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদাকে বলিলেন, 'আমি বাগবাজারে গিরিশের বাড়ি যাব, সে বড় কাঁদছে। অনেকে তাঁহাকে গিরিশবাবুর বাড়িতে যাইতে বারণ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া রামলাল দাদাকে দৃঢ়স্বরে গাড়ি আনতে আদেশ করিলেন। তখন দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলে ভাড়া গাড়ি পাওয়া যাইত না। গাড়ি আনিতে হইলে বরাহনগরের বাজারের নিকট হইতে আনিতে হইত, সেই জন্য বিলম্ব হইত। ৺কালী বাড়িতে গাড়ি আসিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভোর অবস্থায় গাড়িতে উঠিয়া কোচোয়ানকে বলিতে লাগিলেন, 'চালাও, খুব জোরসে চালাও।' যেন গিরিশবাবুর বাড়িতে যাইবার বিলম্ব তাঁহার আর সহ্য হইতেছে না। অবশেষে বেলা ৪॥টা বা ৫টার সময় গিরিশবাবুর বাড়িতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

দুর্গাচরণ নাগ—নাগমহাশয় একদিন গিরিশবাবুর ঘরে বসিয়া

কথাবার্তা কহিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে গিরিশবাবু নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ নাগমশাই, আপনার পিতার সহিত কি আপনার ধর্মমতের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে ?" এই কথা শুনিয়া নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না, না, সে সব প্রভেদ মিটিয়া গিয়াছে ; আমার পিতাও সারাদিন জপ করেন।" নাগমহাশয় আরও বলিলেন তাঁর পিতা যদিও সব সময় জপ করেন কিন্তু এখনও তাঁর ছেলের উপর যথেষ্ট ভালবাসা রয়েছে,—নিজের ছেলে এ জ্ঞানটা এখনও রয়েছে।" গিরিশবাবু বলিলেন, "আপনার মতন এমন সন্তানকে স্নেহ করবেন এ তো সৌভাগ্যের কথা।" নাগমহাশয় তখন বুক ও মাথা দোলাইয়া বালকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "তাতে কি হলো মশাই, এ যে নঙ্গর ফেলে দাঁড়টানা হচ্ছে ; ছেলের উপর ভালবাসা রেখে জপ কল্লে মনটা কতদূর আর এগোয় ?" নাগমহাশয় কথাগুলো এমন মিষ্ট ও স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিলেন যে সকলেই স্থিরচিত্তে এক মন হইয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। যদিও তখন নাগমহাশয়ের দেহ কৃশ, মাথায় কতগুলি চুল ছিল কিন্তু তাঁহার মানসিক শক্তি জ্যোতিঃপূর্ণ নেত্রেই প্রকাশ পাইতেছিল। এরূপ তীব্র অন্তরভেদকারী, স্নিগ্ধ, মধুর আকর্ষণকারী চাহনি খুব কম লোকের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ দৃষ্টির সামনে পাণ্ডিত্য, তর্ক বিতর্ক বা অন্য কোন প্রকার চাপল্যভাব স্থান পায় না। ইহা কেবল উচ্চাবস্থায় মহাত্মাদিগেরই ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্য নাগমহাশয়ের আমলকী আনয়ন করা—কাশীপুরের বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একবার আমলকী খাইতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তখন আমলকীর সময় ছিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব আমলকী খাইতে ইচ্ছা করেছেন শুনিয়া নাগমহাশয় দ্বিধা না করিয়া আমলকীর অন্বেষণে বাহির হইয়া গেলেন। তিন দিন নানা স্থান ঘুরিয়া শেষে গুটি কতক আমলকী লইয়া আসিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইচ্ছা বা আজ্ঞা

নাগমহাশয়ের নিকট বেদবাক্যের মতন ছিল, কঠোর তপস্যা করা আর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্য আমলকী অন্বেষণ করা তঁাহার কাছে উভয়ই সমান ছিল। এইরূপ গুরুভক্তি জগতে বিরল এবং চিরকাল আদর্শ হইয়া থাকিবে।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন করা —একদিন সন্ধ্যার সময় বলরামবাবুর বড় ঘরটিতে অনেকে বসিয়া আছেন। এমন সময় গিরিশবাবু ডান দিককার কাপড়ে কতকগুলি পান রাখিয়া কাপড়ের কসিটি ট্যাঁকে গুঁজিয়া পূর্বদিক হইতে দ্বিতীয় দরজার কাছে আসিয়া বসিলেন। গিরিশবাবু বড় পান খাইতে ভালবাসিতেন, সেইজন্য যেখানে যাইতেন সঙ্গে করিয়া পান লইয়া যাইতেন। সেদিন তিনি বড় প্রফুল্ল; উত্তেজিত ও আপনভাবে বিভোর ছিলেন। গরমকাল, রাস্তার দিকের বারান্দা হইতে বেশ ফুরফুরে হাওয়া আসিতেছিল। গিরিশবাবু ঘরে বসিয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সম্ভবতঃ শরৎমহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, একদিন বিকালবেলা বোস-পাড়ার গলির মোড়ে গোঁসাইদের রকে বসে আছি, দেখি যে বাগবাজার ষ্ট্রীট থেকে একখানি ভাড়াগাড়ি বলরামের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। গাড়িখানার ভেতরে পেছনকার গদিতে একটি লোক আর সামনের গদিতে দুটি কি একটি লোক বসেছিল। গোঁসাইদের রকে যারা বসে ছিল, তারা বলে উঠল, 'ইনিই হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস'। আমিও মুখ ফিরিয়ে তাঁকে দেখতে লাগলুম এবং তিনিও আমার দিকে তাকালেন। তখন প্রণাম পদ্ধতি বিশেষ কিছু জানতুম না। তিনি প্রথমে গাড়ি থেকে দু'হাত তুলে আমাকে প্রণাম করলেন। আমিও তাঁহাকে প্রণাম কল্লুম। তিনি আবার আমায় সেই রকম করে প্রণাম করলেন, আমিও আবার তাঁহাকে প্রণাম কল্লুম। এইরূপে পরস্পর দুজনায় প্রণাম চলিল শেষকালে আমি বেদম হয়ে গেলুম আর তাঁহার প্রণামের সংখ্যা অধিক হলো। মনে মনে আমি

ভাবলুম এ পাগলটা আবার কি রকম। তিনি সকরুণভাবে আমার দিকে একবার চাহিলেন, আমার বুকের ভেতরটা যেন চন্ চন্ করে উঠল! তিনি তখন গাড়ি করে বলরামের বাড়ির দিকে চলে গেলেন। আমি সেই রকে বসে রইলুম কিন্তু বুকের ভিতরটা তাঁর সঙ্গে বলরামের বাড়ির ভিতর চলে গেল। তখন মন অভিমানে পূর্ণ, বলরাম ডাকেনি, তার বাড়িতে যাব? কিন্তু প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠলো, যদি একবার কেউ মুখে বলে তাহলে যাই। আমার মনটা তখন বড় অস্থির হয়ে উঠেছিল, কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলুম না। একটা গুরু বা যা হউক একটা কিছু পেলে বুকটা ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু সকলের উপরে অবিশ্বাস– আর সকলের চেয়ে যে আমি বেশী বুদ্ধিমান ভিতরে এই অহঙ্কার।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রশ্ন করা— "খানিকক্ষণবাদে বলরামের বাড়ি থেকে একজন আমায় ডাকতে এসে বল্লে, 'আপনাকে পরমহংসমশাই ডাকছেন'। আমি ত চটি জুতা পায়ে দিয়ে খালি গায়ে দৌড়ে গেলুম। যাইবামাত্র আবার সেই আগেকার মতন প্রণাম চলল, এবারও আমি পরাস্ত হলুম। আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'গুরুর আবশ্যক কি? তিনি শুনিবামাত্র বল্লেন, 'তোমার হয়ে গেছে। তোমার হয়ে গেছে। আর তোমার কিছু আবশ্যক নেই।' আচম্বিতে এই কথাটা শুনে আমার বুকে হঠাৎ একটা শান্তি এলো, আহ্লাদে আমার চোখে জল এসে পড়লো। এক নূতন ভাব যেন আমার বুকে এলো—জ্বলন্ত আগুন যেন জল দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। খানিকক্ষণ নিজেকে সামলিয়ে ফের জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'গুরু কি?' তিনি বল্লেন, 'সংযোজক অর্থাৎ ইষ্ট ও ভক্তের মিলন করিয়ে দিয়ে স্বয়ং অন্তর্ধান হন।' জানত আমি থিয়েটারের লোক —সেজন্য থিয়েটারের ভাষায় বলেছিলুম। সেদিন থেকে আমার ভিতরে আর একভাব বইতে লাগল।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামের বিশেষত্ব—প্রণামের কথা বলিতে-বলিতে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ রাম-অবতারে ধনুক বাণে

জগৎ জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ-অবতারে বংশীধ্বনিতে জগৎ জয় হয়েছিল, এবার প্রণাম অস্ত্রে জগৎ জয় হবে। গিরিশবাবু কথাগুলি এমন ওজস্বিভাবে বলিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল গিরিশবাবু নূতন ভাবে প্রণামের ব্যাখ্যা করিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রণামে ও বিনয়ে যে একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল এইটাই তিনি সেদিন সকলকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। গিরিশবাবুর কথা শুনিয়া সেইদিন সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের যীশুর উপাখ্যান শুনা—১৯০৮ বা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশবাবুর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া হয়; তাহাতে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে যীশুর কথা উঠিল। বাইবেলে একটি উপাখ্যান আছে যে, কোন একটি স্ত্রীলোক অনেক দিন হইতে প্রদর রোগে ভুগিতেছিল। তাহার মনে ধারণা জন্মিল যে, সে যদি একবার কোন রকমে যীশুকে ছুঁইতে পারে তাহা হইলে তাহার রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইয়া যাইবে। এইরূপ মনে করিয়া সেই স্ত্রীলোকটি একদিন যীশুর সঙ্গে দেখা করিতে যায়। গিয়া দেখে যে যীশু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তাহার চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য, ভিড়ে লোকে ঠেলাঠেলি করিতেছে। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি যীশুকে সিদ্ধপুরুষ বা অবতার জ্ঞানে কোন রকমে যীশুর বস্ত্র-প্রান্ত ছুঁইয়া যীশুকে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার রোগ তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হয়। কিন্তু ভিড়ের ভিতর যীশুকে ছুঁইতে তাঁহার শক্তি ক্ষয় হওয়াতে তিনি মুখ ফিরাইয়া পিটারকে (পাতর) জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আমায় স্পর্শ করিয়াছে? আমি টের পাইয়াছি কেহ আমাকে স্পর্শ করিয়াছে।" পিটার বলিলেন, "এত ভিড়ের ভিতর কিছু কি স্থির করে বলা যায়?" যীশু তখন বলিলেন, "আমোদ দেখিতে অনেকে ধাক্কা মারিয়াছে কিন্তু ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে একজন আমায় স্পর্শ করিয়াছে এবং তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" এই ভাবের কথাবার্তা হইতে লাগিল। এই উপাখ্যানটি লইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের

ভিতর আলোচনা হইতেছে এমন সময় সহসা গিরিশবাবুর ভাবান্তর হইল। তিনি অপর এক ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, ঘাড়ে মাথা যেন রাখিতে পারিতেছেন না, অনবরত এধার ওধার মাথা দুলাইতেছেন, চক্ষু নিমীলিত ও বাক্য শ্লথ হইয়া আসিল। তিনি ঐকান্তিক জলন্ত ভক্তির সহিত মৃদু অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, "বাঃ কি সুন্দর যীশুর উপাখ্যানটি। ঠিক কথাই বটে, ঠিক কথাই বটে, হাজার হাজার লোক আমোদের জন্য যায়, একজন কি দু'জন দেখবার জন্য যায়। খুদিরাম চাটুজ্জের ব্যাটা গদাই চাটুজ্জেকে হাজার লোক দেখেছিল কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ক'টা লোক দেখেছিল? ওরে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ক'টা লোক দেখেছিল রে?" এই কথাটি বলিতে বলিতে তিনি স্থির হইয়া গেলেন,—যেন মহা গভীর চিন্তার ভিতর চলিয়া গেলেন। তাঁহার সেদিনকার ভাব দেখিয়া সকলেই বেশ অনুভব করিতে লাগিলেন যে রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বতন্ত্র, গদাই চাটুজ্জে স্বতন্ত্র। অল্প কথার ভিতর তিনি একটা জলন্তভাব জাগ্রত করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিজ্ঞান শিখিবার ইচ্ছা—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গিরিশবাবুর বিজ্ঞান শিখিবার ভারি ঝোঁক উঠিল। তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ইলেকট্রিসিটির বক্তৃতা শুনিতে বৌবাজারে সায়ান্স এসোসিয়েসনে যাইতেন এবং অতি মনোযোগসহকারে পরীক্ষাগুলা দেখিতেন। তখন তিনি ঠিক যেন বিদ্যার্থী বালক হইয়া যাইতেন। তিনি যে জগতের বহু বিষয় জানিতেন এবং স্বয়ং যে বহু পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন সেসব বিষয় তখন তাঁহার মনে থাকিত না।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার—পণ্ডিত লোকদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, সকল বিষয়ই তাঁহারা মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া শোনেন। একদিন পরীক্ষার পর মহেন্দ্রলাল সরকার খুব প্রফুল্ল হইয়া গিরিশবাবুকে বলিলেন, "দেখলে, কেমন সেল ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ বেরিয়ে চুম্বকছুঁচটিকে

বোদ্‌লে দিলে ?" গিরিশবাবুর সহিত মহেন্দ্রলাল সরকারের পূর্ব হইতেই বিশেষ জানাশুনা ছিল এবং কথার জবাবও চলিত। গিরিশবাবু ফস করে মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলিলেন, "আপনার ঐ ভাঁড়টা (সেল ব্যাটারী) যদি পৃথিবীর মত হত আর ছুঁচটা যদি সুমেরু পাহাড়ের মত হত তাহলে আপনার উত্তর দক্ষিণ কি করে ঠিক হত ? তাহা শুনিয়া মহেন্দ্রলাল সরকার মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যাও, তোমার কেবল ঐ সব খুঁত ধরা।" কারণ পৃথিবীর বাহিরে যাইলে অর্থাৎ অনন্তে মিশিয়া গেলে উত্তর দক্ষিণ বা উঁচু নীচু বলিয়া কোন শব্দ থাকে না।

গিরিশবাবু প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার ঔষধ দিবার এবং বই লিখিবার প্রথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। নাটকের যে চিত্রটি বর্ণনা করা হইবে তিনি স্থির হইয়া সেই বিষয়টি ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে সেই দৃশ্যগুলা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত এবং কার্যকারণ ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহা প্রকাশ করিতেন। গিরিশ-বাবু হাওয়ার ভিতর অলক্ষিত-লক্ষিত বস্তুকে দেখিতেন এবং বিভোর হইয়া ভাষায় তাহা বলিয়া যাইতেন। এইজন্য অপর ব্যক্তিকে তাঁহার কথাগুলি লিখিয়া লইতে হইত। তাঁহার বলিয়া যাইবার সময় লেখক যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তিনি বড় বিরক্ত হইতেন, এমন কি পরে লেখককে ভৎর্সনা করিতেন। তিনি পশ্চিমদিকের উপরকার ছাদেতে পায়চারি করিতেন এবং কি যেন দেখিতেছেন এইরূপ ভাবে বিভোর হইয়া অনর্গল বলিয়া যাইতেন। এই ভাবটি তিনি তাঁহার পুস্তকেও প্রকাশ করিয়াছেন। "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" উত্তরা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সঙ্গীতের আছে কি আকার ?" অর্থাৎ প্রত্যেক ভাবের একটা স্পষ্ট রূপ আছে। ভাবের এই রূপটি স্পষ্টাক্ষরে না দেখিতে পাইলে উপলব্ধি হয় না। সেইজন্য এই দার্শনিক তথ্যটি গিরিশবাবু তাঁহার পুস্তকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিবার প্রথা— গিরিশবাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পাড়ার লোকদিগকে তিনি ঔষধ দিতেন। পীড়ার কারণটি সমস্ত শুনিয়া স্থির হইয়া ভাবিতেন এবং সেই পীড়াটি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত। সেই ভাবটি রোগীর কোন্ জায়গাটায় ক্ষত হইয়াছে বা বিপর্যস্তভাব ধারণ করিয়াছে স্পষ্ট দেখাইয়া দিত এবং কি ঔষধ ও উপকরণ দিলে সেই স্থানটি পরিপূর্ণ হইবে তাহাও প্রত্যক্ষ করাইয়া দিত। গিরিশবাবু তদনুযায়ী ঔষধ রোগীকে দিতেন। এই একাগ্রতা ও প্রত্যক্ষদর্শন ক্ষমতা থাকায় তিনি সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের মানব-জীবন দেখিবার প্রণালী— একদিন গিরিশবাবু গঙ্গার ধার হইতে বেড়াইয়া বাগবাজার ষ্ট্রীট দিয়া নিজের বাড়িতে ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে কেহ ছিল না, একাকী আপন মনে স্বচ্ছন্দে পায়চারি করিতে করিতে আসিতেছিলেন। খানিকটা আসিলে বর্তমান লেখক গঙ্গার দিক হইতে আসিয়া, পাছে গিরিশবাবুর চিন্তায় কোন ব্যাঘাত জন্মায় তজ্জন্য তাঁহার কিছু দূরে পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু ধীর পদবিক্ষেপে রেলের অপর পার্শ্বে বুড়ো ভটচার্জি কেমন করে খড়ম পায়ে দিয়ে ঘটি করে তুলসী গাছে জল দিচ্ছে, ঘরের ভিতর গিয়ে লোককে বকছে আর সেই সময় কেমন করে চোখ মুখ ঘোরাচ্ছে এবং নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি কচ্ছে, সেই সমস্ত ঘটনাটি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের মনের মধ্যে ফটোর মত তৎক্ষণাৎ যেন তুলে নিচ্ছেন। আবার কিছুদূর গিয়া একটি মুদীর দোকানে কেমন করে মুদী ধামার চালগুলা দু'হাতে উছলে উছলে চূড়োপানা কচ্ছে, দাঁড়িপাল্লাটি কি করে ঝাড়ছে ও একটির উপর আর একটি দিয়ে কি করে ঘুরিয়ে পাতার উপর ডাণ্ডিটা কাৎ করে রাখছে, কেমন করে মুদী দোকানের জিনিসপত্তর সব একটির পর একটি সাজিয়ে রাখছে, গিরিশবাবু সেই সমস্তগুলা স্থিরচিত্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে লাগিলেন।

তাহার পর একটি ফুলুরির দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া তাহারা কেমন করে মেঝেতে মাদুর পেতে সকলে মিলে বসে একটি পিঁড়ে বার করে তাতে পাশা চালছে এবং সেই পাশা চালা ও তার দান পড়বার সময় সকলে কেমন মুখভঙ্গি করিয়া হর্ষ ও শোকের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছে, সেই সমস্তগুলি তিনি তথায় দাঁড়াইয়া ফুলুরির দোকানের আড্ডার ব্যাপারখানা স্থির মনে দেখিতে লাগিলেন, তাহাদের কথাবার্তাগুলি যেন চুষে নিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ ফুলুরির দোকানের লোকেরা তাঁহাকে চিনিত না সেইজন্য তাহারা গিরিশবাবুকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। তাহার পর গিরিশবাবু ধীরে ধীরে পুনরায় চলিতে লাগিলেন এবং পরে বর্তমান লেখকের সহিত কথাবার্তা হইতে লাগিল।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনের বিশেষত্ব—গিরিশবাবুর ভাব-ছিল—'কোন জিনিসটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বলিয়া গণ্য করিও না; প্রত্যেক জিনিসটিকে শ্রদ্ধা করিয়া দেখিবে কারণ তাহার ভিতর অনেক জানিবার ও শিখিবার জিনিস আছে এবং এক সময়ে সেই সমস্ত জিনিস কোন না কোন বিশেষ কাজে লাগিবে।' যে মহৎ, সে প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক কার্যের ভিতর মহৎকে দেখিতে পায়। যে নিজে হীন সে জগতের প্রত্যেক বস্তুকে হীন ও তুচ্ছ বলিয়া দেখে। গিরিশবাবু সকল কার্যে ও কথাতে এই ভাবটি প্রকাশ করিতেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের উড়েদের যাত্রা শুনা—গরমকালে গিরিশবাবুর বাড়ির পশ্চিম দিকের দোতলার খালি ছাদের উপর মাদুর পাতিয়া অনেকে বসিতেন। বাড়ির পশ্চিম দিকে তখন অনেক খালি জায়গা পড়িয়াছিল এবং কোণের দিকে পুকুরে তখনও জল ছিল ও তাহার ঘাট বাঁধান ছিল। কতকগুলি রাস্তার খোয়াপেটা উড়ে পুকুর পাড়ের খালি জমিতে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত। একদিন বৈকালবেলা মাদুর পেতে সকলে বসে আছে ও নানা রকম কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় পুকুর পাড়ের দিকের উড়েগুলো খচ্ মচ্ করে বাজনা বাজিয়ে যাত্রা শুরু করে। উপস্থিত সকলেই উড়েদের বাজনা ও যাত্রা

শুনিয়া বিরক্ত হইয়া গালমন্দ করিতে লাগিল। গিরিশবাবু কিন্তু হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পশ্চিম দিকের গোল থামের উপর বাম হাতটা রাখিয়া এবং তাহার উপর বাম গালটা পাতিয়া এক দৃষ্টিতে নিষ্পন্দ হইয়া স্থিরভাবে উড়েদের যাত্রা-প্রকরণ দেখিতে লাগিলেন। ছাদে কেহ নূতন লোক আসিল, কি কেহ চলিয়া গেল সে বিষয়ে কোন হুঁস নাই। কে কি গল্প করিতেছে বা কে কি করিতেছে সে সব বিষয়েও তিনি যেন কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না। উড়ে-যাত্রাতে তাঁহার মন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। এমনিভাবে প্রায় এক ঘণ্টা উড়ে-যাত্রা শুনিয়া তিনি পুনরায় মাদুরে আসিয়া বসিলেন। কিন্তু অন্য ভাব, যেন কোন গভীর চিন্তায় রহিয়াছেন। আর সেই ভাবটি কি ভাবে কার্যে লাগাইবেন সেইটি যেন তাঁহার মুখে বিকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার গ্রন্থে যে এই প্রকার বহুবিধ ভাব আছে তাহা তিনি এইভাবেই শিখিয়াছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ও বর্তমান লেখক—একদিন দুপুরবেলা বর্তমান লেখক গিরিশবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন। শরৎমহারাজ সেদিন গিরিশবাবুর বাড়িতে আহার করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু বাড়ির ভিতরে, শরৎমহারাজ সবে আঁচাইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন এমন সময় বর্তমান লেখককে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে যদি আর একটু আগে আসতে তা হলে জি সির একটা রগড় দেখতে পেতে। ভাত বাড়তে একটু দেরি হয়েছিল সেই সময়ে জি, সি, দুটো হুলো বেড়াল কেমন করে ঝগড়া করে সেইটি দেখাতে লাগলো।" তখন বাহিরে কেহ ছিল না এইজন্য শরৎমহারাজ উত্তেজিত স্বরে নিজেই গিরিশবাবুর বেড়ালের ঝগড়ার অভিনয় করিতে লাগিলেন। উপুড় হয়ে শুয়ে মুখটা উপর দিকে বাঁকিয়ে ডান হাতে থুলো মারিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে নানারূপ স্বর করিয়া ম্যাউ ম্যাউ করিয়া আওয়াজ করিতে লাগিলেন। শরৎমহারাজের অভিনয়টি বেশ সুন্দর হইয়াছিল, তাহা হইলে গিরিশবাবুর অভিনয় কত সুন্দর হইয়াছিল

তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এই উপাখ্যানটির উদ্দেশ্য এই যে, গিরিশবাবু অতি সামান্য জিনিসকেও শিখিবার ও সাধনার জিনিস বলিয়া লইতেন। এইজন্য তাঁহার নাটকগুলিতে এই রকমের চিত্রগুলি অতি নিখুঁত ও নির্ভুল হইয়াছে।

পওহারি বাবার শিষ্যের আত্মকাহিনী—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের অষ্টমী পূজার দিন বর্তমান লেখক যখন গাজীপুরের মুন্সেফ্ শিরিশচন্দ্র বসুর সহিত পওহারি বাবাকে দর্শন করিতে যান তখন পওহারি বাবার প্রধান শিষ্য একটি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। পওহারি বাবার আশ্রমে তখন দুইজন লোক থাকিতেন। একটি তাঁহার ভ্রাতা—খুব দীর্ঘাকৃতি পুরুষ এবং আর একটি তাঁহার শিষ্য, অধিকতর দীর্ঘাকৃতি এবং তাহার হাত, পা, বুকও সেই পরিমাণে দীর্ঘ ও প্রশস্ত। শিষ্যটি সাধু ছিলেন এবং ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। তিনি অতি বিনীতভাবে আত্মকাহিনী কহিতে লাগিলেন।

"গঙ্গার ওপারে নিকটবর্তী কোন গ্রামে আমার জন্মস্থান ছিল। সংসার করিয়াছিলাম। অর্থ উপার্জনের কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ডাকাতি করিতে সুরু করি। একদিন মনে করিলাম যে গঙ্গার ওপারে একটা বোকা সাধু (পওহারি বাবা) থাকে। তাহার কাছে চাল, ডাল, লোটা, কম্বল প্রভৃতি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু আছে, সেই সব জিনিস নিশ্চয় আনা যাইবে। গঙ্গায় তখন অল্প জল ছিল ডাণ্ডাটা নিয়ে ত গঙ্গার খানিকটা হেঁটে, খানিকটা বা সাঁতরে এসে পার হয়ে পওহারি বাবার ঘরে এসে উপস্থিত হইলাম। অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে একখানা কম্বল পাওয়া গেল। সেই কম্বলখানা মাটিতে বিছাইয়া চাল, ডাল, আর সব যা কিছু পাওয়া গেল সেই সমস্ত একসঙ্গে বাঁধিয়া লইয়া বড় একটা গাঁটরি করিয়া পুনরায় গঙ্গা পার হইতে লাগিলাম। গঙ্গা পার হইয়া যেমনি ওদিককার কিনারায় পৌঁছিয়াছি এমন সময় পিছন ফিরিয়া দেখি যে আর একটা লোক আমার মতন একটা পুঁটলি লইয়া আমার পিছনে

পিছনে আসিতেছে। তখন পালাইবার জন্য আমি হনহন করিয়া চলিতে লাগিলাম। সেও আমার পিছনে পিছনে খুব জোরে চলিতে লাগিল। শেষে আমি দৌড়াইতে লাগিলাম, সেও সেই দেখে দৌড়াইতে লাগিল। খানিকক্ষণ এইরূপ দৌড়াইয়া আমি হাঁপাইয়া পড়িলাম আর দৌড়াইতে পারিতেছিলাম না, তখন সেই লোকটি স্নেহভরে অতি মধুরকণ্ঠে আমার পিছন হইতে বলিতে লাগিল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, দৌড়াচ্ছো কেন? হাঁপিয়ে গেছ যে?' তাঁর গলার আওয়াজ শুনিয়া আমি এক জায়গায় থামিয়া গেলাম, তখন পিছনকার লোকটি আমার কাছে আসিল। আমি চোর, কাজেই আমার প্রাণে ভয় হইল, তখন আমি চোরা-গাঁট্রি রাখিয়া বলিলাম, 'আমায় পুলিশের হাতে দেবেন না—আমায় মারবেন না—আপনার গাঁট্রি নিন, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার উপর দয়া করুন'। পিছনের লোকটি বলিলেন, 'তুমি এত ভয় খাচ্ছ কেন? এত উদ্বিগ্ন হয়েছ কেন? অচেনা জায়গা, কোথায় কি থাকে তুমি ত জানতে না, সেইজন্য অনেক জিনিস ফেলে এসেছ। তোমার ছেলেপুলে আছে, তোমার ত জিনিসপত্রের বিশেষ আবশ্যক, তাই আমি সব জিনিস তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি—তা তুমি অত দৌড়ালে কেন? আমি আর তোমার সঙ্গে যেতে পাচ্ছি না, তুমি একটু ধীরে ধীরে চল, জিনিসগুলি তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি'। পিছনকার লোকটি যখন আমার প্রতি ক্রোধ না করিয়া এমন স্নেহপূর্ণস্বরে এই সব কথা কহিতে লাগিলেন তখন আমার বুকের ভেতরটা যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কি করেছি? কার বাড়িতে চুরি করতে গিয়াছিলাম? এরূপ সাধুর মনে আমি কষ্ট দিয়াছি? ধিক্ আমার ঘর সংসার। তখন আমি সাধুটির পায়ে জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, 'আমায় একটু আশ্রয় দিন, এ সংসারে আমায় দয়া করিবার কেহ নাই; আপনি আমায় কৃপা করে কাছে রাখুন'। অনেক অনুনয়ের পর তিনি সম্মত হইলেন এবং গাঁট্রি লইয়া আমরা পুনরায় এইখানে (আশ্রমে) ফিরিয়া আসিলাম। সেই হইতে আমি

এখানেই আছি আর এঁর সেবা করিয়া থাকি। পূর্বে আমি একজন চোর ছিলাম; সেই কথাই আপনাদিগকে শুনাইলাম ইহাই আমার পূর্ব-কাহিনী।” শিষ্যটির বয়স তখন আন্দাজ ৫৫-৬০ বৎসর হইয়াছে তিনি এমন সরলভাবে আত্মকাহিনী বলিয়া গেলেন যে তাহা শুনিয়া মনে হইল যে লোকটি প্রকৃতই সাধু হইয়াছে এবং প্রাণে পরম শান্তি পাইয়াছে।

সারদানন্দ স্বামী সহ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নবদ্বীপ গমন ও জনৈক ভট্টাচার্য—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী একবার নবদ্বীপ দর্শন করিতে যান, সঙ্গে শরৎমহারাজ, যোগেনমহারাজ প্রভৃতি ছিলেন। নবদ্বীপে শরৎমহারাজ শুনিলেন যে একজন ন্যায়রত্ন বা ন্যায়বাগীশ খৃষ্টান হইয়া গিয়াছেন। শরৎমহারাজ বিস্মিত হইয়া সেই ন্যায়রত্নের সহিত দেখা করিতে যান। শরৎমহারাজ তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইলে সেই পণ্ডিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া শরৎমহারাজকে বসাইলেন। ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যেমন হইয়া থাকেন, তিনিও সেই রকমের লোক, বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বয়সে প্রবীণ এবং নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ধর্মপিপাসু হইয়া কোন শাস্ত্রে শান্তি না পাইয়া অবশেষে যীশুর ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তদবধি শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে বাইবেল ও অপর ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করিতেন। তিনি খুব উদার এবং সাধক ছিলেন। শরৎমহারাজ তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন যে নবদ্বীপের পণ্ডিত হইয়া শেষে তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিলেন। যাহা হউক ধর্ম বিষয়ে খুব উচ্চ স্তরের কথাবার্তা হইতেছিল এমন সময় জানালার ভিতর হইতে একটি মুরগী বাহির হইয়া ভট্টাচার্যের গায়ের উপর দিয়া ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া পালক ও বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার পর একটি স্ত্রীলোক সেই মুরগীটিকে ধরিবার জন্য এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল ও শেষে ধরিয়া লইয়া যাইল।

ভট্টাচার্য খানিকক্ষণ গুম হইয়া থাকিয়া সক্রোধে শরৎমহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "ইহাকেই বলে জ্যান্ত নরক ভোগ। আমি ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, শিব পূজা, নারায়ণ পূজা না করে ছেলে বেলায় কখনও জল খাইনি। কপালের বিপাকে খৃষ্টান হলাম এবং এই মুসলমান মাগীটাকে বিবাহ করতে হলো। বৃদ্ধ বয়সে এই মুসলমানের হাতে অন্ন খেতে হচ্ছে, আর ঘর-দোর, পুঁথির উপর মুরগী বেড়াচ্ছে, পালক ও বিষ্ঠা ত্যাগ করছে এমন কি থালার ভাতেতেও মুরগী এসে ঠুক্‌রে যাচ্ছে। কথা কহিলে মহা ঝগড়া হয়; এর চেয়ে আর নরক যন্ত্রণা কি বলতে পারেন? গঙ্গার তীরে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে এই দুর্গতি! আত্মহত্যা মহাপাপ, এই জন্য করি নাই।" এইরূপ কথা বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের যন্ত্রণা দেখিয়া শরৎমহারাজ বড় ব্যথিত হইয়াছিলেন। আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিয়া শরৎমহারাজ অনেকের কাছে এ কথা বলিয়াছিলেন এবং মনে মনে ভট্টাচার্যের দুঃখের কথা ভাবিতেন।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও সত্যচরণ—নিরঞ্জনমহারাজ ও তুলসীমহারাজ একদিন সত্যকে (রাখালমহারাজের পূর্বাশ্রমের পুত্র) লইয়া ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের মাতার সহিত দেখা করিতে আসেন। আত্মীয় হিসাবে নরেন্দ্রনাথের মাতা সত্যর দিদিমা হইতেন। নিরঞ্জনমহারাজ ও তুলসীমহারাজ সত্যকে রাগাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "তুই ব্যাটা রাহুল" অর্থাৎ বুদ্ধদেবের ছেলে রাহুল যেমন ছিল, রাখালমহারাজের ছেলেও সেই রকম। "তোর বাপকে সন্ন্যাসী করেছি, তোকেও করবো। চল ব্যাটা তোকে নিয়ে গিয়ে মঠে রেখে আসি।" সত্য বালক ছিল বটে কিন্তু তার গায়ে খুব সামর্থ্য ছিল। সে তো এই কথা শুনে রেগে নিরঞ্জনমহারাজ ও তুলসীমহারাজকে ছোট ছোট হাত দিয়া মারিতে লাগিল। সেদিন রাস্তায় খোয়া ঢালা ছিল সেই সব ঝামা খোয়া তুলিয়া তুলসীমহারাজ ও নিরঞ্জনমহারাজকে মারিবার উদ্যোগে ছুটিল এবং ইহারা দুজনায়, "ব্যাটা রাহুল, তোকে

মঠে নিয়ে যাব" বলে ক্ষেপাইতে লাগিলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথের মাতা আসিয়া সত্যকে কোলে লইয়া শান্ত করিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সত্যচরণ—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে খেলিতে খেলিতে সত্যর বুকে একটা আঘাত লাগে তাহাতেই তার হৃদ্‌রোগ হয়। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কাঁসারিপাড়ার সেনেদের বাড়িতে অর্থাৎ রাখালমহারাজের মাতুলের বাড়িতে রাখা হয়। শীতকাল, রাখাল মহারাজ অতি প্রত্যুষে বলরামবাবুর বাড়ি হইতে রামতনু বসুর গলির বাড়িতে আসিতেন এবং বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্তী সেনদের বাড়িতে যাইয়া সন্তানকে দেখিয়া আসিতেন। এইরূপে তিনি নিত্যই দেখিয়া যাইতেন। যদিও তিনি বাহ্যিক কোন ভাব প্রকাশ করিতেন না এবং নবাগত ব্যক্তিরাও কিছু বুঝিতে পারিত না কিন্তু ভিতরে তাঁহার মন বড় চঞ্চল হইয়া থাকিত। আত্মগোষ্ঠীরা ইহা বেশ বুঝিতে পারিত। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল বা মে মাসে ছেলেটির মৃত্যু হয়। ইহাতে রাখালমহারাজ বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। ইহার পর আর তিনি তাঁহার জন্মভূমি, বৈমাত্র ভাই বা আত্মীয় স্বজনের কোন উল্লেখ করিতেন না বা সংস্রবও রাখিতেন না।

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পাণ্ডাদের ভোজন করানো—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর যোগেনমহারাজ শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীকে লইয়া বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে সেই সময় কয়েকটি স্ত্রীলোকও গিয়াছিল। যোগেনমহারাজ ও অপর সকলে বলরামবাবুর কুঞ্জে বাস করিতেন এবং একান্ত মনে জপ-তপ ও সাধন-ভজন করিতেন। যোগেনমহারাজ অতীব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। চোবে ও পাণ্ডা ভোজন প্রথানুযায়ী একদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গুটি কতক চোবে ও পাণ্ডা নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের লোকেরা তরকারি অতি আহ্লাদ করিয়া আহার করে সেইজন্য নিমন্ত্রিতদের তরকারি, ছোলার ডাল ও আলুর দম করিয়া ভোজন করাইতে আরম্ভ করেন। তারা

চোবে লোক, লাড্ডু, পেঁড়া বর্‌ফি বোঝে—তরকারির তত ধার ধারে না। প্রথমতঃ তরকারি দিয়েছে, ক্ষুধার্ত চোবে বাবাজীরা ত হাপ্‌রে দু'গালেই তা মেরে দিয়েছে। গোলাপ-মা পরিবেশন করিতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন তরকারি, ছোলার ডাল এরা ত কখন খেতে পায় না সেইজন্য অত চেটেপুটে খাইতেছে। গোলাপ-মা সেইজন্য আহ্লাদ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর একটু ডাল দোবো কি বাবাজী?" এই কথা শুনিয়া চোবে বাবাজী অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে উঠলেন, "হাম ক্যেয়া বয়েল হ্যায় যো বয়েলকা খোরাক খিলাতা।" অর্থাৎ ছোলা বয়েলে খায় সেই জন্য ছোলার ডালটা বয়েলের খোরাক। ইহা শুনিয়া সকলেই ত অপ্রতিভ হইয়া হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে পলাইয়া আসিলেন। অবশেষে সেই দেশের আচার অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি আঁজলা আঁজলা করে লাড্ডু, পেঁড়া প্রভৃতি কতকগুলো তাদের পাতে ঢেলে দিলে তবে চোবে বাবাজীরা একটু ঠাণ্ডা হয় ও মুখে হাসি আসে এবং সুস্থির হইয়া ভোজন করে। এই জন্য কৌতুকচ্ছলে যোগেনমহারাজ ছোলার ডাল প্রভৃতিকে 'বয়েলকো খোরাক' বলিতেন।

বৈদ্যনাথধামে যোগেনমহারাজ ও বাবুরামমহারাজের মাতা—যোগেনমহারাজ বরাহনগর বা আলমবাজার মঠ হইতে তীর্থ দর্শন করিতে চলিয়া যান। কিছুদিন তাঁহার আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। বাবুরামমহারাজের মাতা ও আর কতকগুলি স্ত্রীলোক বৈদ্যনাথ তীর্থ দর্শন করিতে যান। স্ত্রীলোকের স্বভাবই এই—ঠাকুর দর্শন ও সাধু দর্শন করিবে। বৈদ্যনাথে বাবুরামমহারাজের মাতা শুনিলেন যে, কয়েক মাইল দূরে একজন ত্যাগী যুবা সাধু আসিয়াছেন; তাঁহার খুব উন্নত অবস্থা এবং অনেকেই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছে। বাবুরামমহারাজের মাতা অতি সরল প্রাণ—সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিষ্টি লইয়া এক পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া সেই সাধুর আশ্রমে চলিলেন। পাণ্ডা পথে ত্যাগী বাবাজীর অনেক গুণ-কীর্তন করিতে লাগিল। বাবুরামমহারাজের মাতা মনে করিলেন—না জানি কি রকমই বা সাধু হইবে, কত বড়ই

না তার জটা হইবে। তিনি যতই সাধুটির নিকটবর্তী হইতেছেন, পাণ্ডা ততই সাধুর বেশী করিয়া প্রশংসা করিতেছে। অবশেষে দুই জনেই একটি বাগান বা তপোবনে পৌছিলে পাণ্ডাটি তৎক্ষণাৎ সাধুর নিকট চলিল ও হাত মুখ নাড়িয়া বাবুরামমহারাজের মাকে সাধু কোথায় বসিয়া থাকেন তাহা দেখাইতে লাগিল। বাবুরামমহারাজের মাতা সাধুর কাছে গিয়াই সাধুটিকে চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো এ যে আমাদের যোগীন, এ আবার সাধু হবে কেন? এ যে আমাদের বাড়ির ছেলে! হ্যাঁরে যোগীন, তুই বুঝি এখানে এসে সাধু হয়েছিস আর মেড়োদের কাছে রুটি খাচ্ছিস? কোথায় আছিস খবর দিসনি কেন? বাড়ি চ, খাবি চ, তোর ভাত না খেলে পেটের অসুখ হয়, আর রোদ্দুরে বসে সাধুগিরি করতে হবে না।" যোগেনমহারাজ এই সকল কথা শুনিয়া না পারে গম্ভীরভাবে থাকিতে না পারে হাসিতে। অবশেষে বৈদ্যনাথে আসিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। যোগেনমহারাজ হাসিতে হাসিতে অভিনয়চ্ছলে সমস্ত ঘটনাটি মঠে নকল করিয়া বলিতেন।

যোগানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক—বর্তমান লেখক প্রত্যহ বৈকাল ৪টার পর বলরামবাবুর বাড়িতে যাইতেন ও যোগেনমহারাজের কাছে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিতেন। যোগেনমহারাজের আনন্দ হইলেই গালি পাড়িতেন। কিন্তু গালিতে কোন তীব্রতা বা দূষ্যভাব থাকিত না। এমন মিষ্ট ভালবাসাপূর্ণ ভাব ছিল যে তাহা ভাষায় বলা যায় না—খালি তাঁহার ভাষাটা ছিল গালের ছন্দ। গাল একটু কমিলেই নিবন্ত প্রদীপকে উস্কাইয়া দিবার মত আবার একটু ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইত তাহলেই নানাবিধ ভাল প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যাইত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন। হাসি তামাসা চলিতেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাঙ্গের সাধন ভজনের কথাও হইতেছে। এইরূপ উচ্চমনা, সরল প্রাণ, হাস্যকৌতুকপূর্ণ, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি একদিন

বর্তমান লেখক তাঁহার নিকট না যাইতেন তাহা হইলে পরদিবস আহারের পর যোগেনমহারাজ দৌড়াইতে দৌড়াইতে এনং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং সমস্ত সংবাদ লইয়া বর্তমান লেখককে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া যাইতেন।

যোগানন্দ স্বামীর যীশুর উপদেশ বলা—একদিন বলরামবাবুর বাড়ির বারান্দাতে বিকালবেলা যোগেন মহারাজ পায়চারি করিতে করিতে বর্তমান লেখককে বলিলেন, "তুই শ্যালা ত খুব বই পড়িস, শ্যালা বল দিকিনি বাইবেলের শ্রেষ্ঠ কথা কি? যীশু তাহার শিষ্য-দিগকে শেষ কি কথা বলেছিল? বর্তমান লেখক কথাটা ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যোগেনমহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পরস্পরকে ভালবাস (Love each other well)। জানিস শ্যালা সব বাইবেলটা পড়াও যা আর এই কথাটা বোঝবার চেষ্টা করাও তা। যীশু এইজন্য শেষ সময় তার শিষ্যদের এই কথাটি বলে গেছলেন। পরস্পরের প্রতি এই ভালবাসার জন্য গুটিকতক জেলে মালা লোক খৃষ্টান ধর্মটা ছড়িয়েছিল। প্রথম খৃষ্টান দলের এইটাই ছিল মূলমন্ত্র, তাই তারা দাঁড়াতে পেরেছিল। কথাটা অতি সত্য। যোগেনমাহারাজ নিজে অতি উন্নত অবস্থার লোক ছিলেন বলিয়া তাহার চক্ষে এই কথাটি প্রথম ঠেকিয়াছিল।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর তীর্থযাত্রা—সকলেই পশ্চিমে বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া শশীমহারাজেরও তীর্থ-পর্যটনে যাইবার ইচ্ছা হইল। একদিন আলমবাজারের মঠ হইতে শশীমহারাজ অদৃশ্য হইলেন। মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, সকলেই চিন্তিত হইলেন কারণ শশীমহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা ছাড়া অপর কোন জায়গায় যাইতেন না। কয়েকদিন কোন খবর পাওয়া গেল না। অবশেষে শুনা গেল যে তিনি পদব্রজে মানকুণ্ড পর্যন্ত যাইয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হইল।

শশীমহারাজ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুরবেলা একখানা লেপ মুড়ি

দিয়া শুইয়া থাকিতেন। একে দারুণ গরম তাহাতে আবার লেপ মুড়ি, গা দিয়া দরদর করিয়া ঘাম বাহির হইত তাহা না হইলে শশীমহারাজের আরাম বোধ হইত না। সেইজন্য বর্তমান লেখক তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন, "পোষে পোষকাম্‌ড়ি আর বৈশাখে ঝাঁাতলা মুড়ি।" সেই কথা শুনিয়া বর্তমান লেখককে শশীমহারাজ বলিতেন, "যা ছোঁড়া যা, ঠাট্টা করতে হবে না; আমার লেপ মুড়ি না দিলে ঘুম হয় না।"

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সারদামহারাজ অনেক জায়গায় যাতায়াত করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন তাহা কাহারও বিশেষ স্মরণ নাই, তবে যেটুকু স্মরণ আছে তাহাই এখানে লিখিত হইল। একবার ৺কাশীধামে তিনি শিবানন্দ স্বামীর নিকট ছিলেন। একদিন জ্বর হওয়ায় খুব বমি করিতে লাগিলেন। বমির সময় তিনি বিকৃতস্বরে, 'আমি গেলাম, আমি গেলাম' না বলিতে পারিয়া 'গিলি গিলি' করিয়া রব করিয়াছিলেন। সেইজন্য শিবানন্দ স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে 'গিলি গিলি' বলিয়া ডাকিতেন। তাহার পর সারদা-মহারাজ অন্য কয়েক স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে খবর পাইলেন যে, নরেন্দ্রনাথ তখন গুজরাটে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বেহারিদাসের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। সেই খবর পাইয়া সারদামহারাজ সেইদিকে চলিলেন। নরেন্দ্রনাথ সারদামহারাজকে ধরা দিবেন না এই উদ্দেশ্যে আগে আগে চলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের তখন ঘোর বৈরাগ্য, কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না। অবশেষে কয়েকদিন সারদামহারাজের সহিত দেখাশুনা না করায় তাঁহার পূর্বস্নেহ পুনরায় ফিরিয়া আসিল; তখন তিনি সারদামহারাজকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া যত্ন করিয়া রাখিলেন।

নরেন্দ্রনাথের পিতা একখানি মলিদা চাদর ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথও পরে সেই মলিদা চাদরখানি ব্যবহার করিতেন। নরেন্দ্রনাথ গুজরাটে অবস্থানকালে নিজের চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ চাদরখানি সারদামহারাজকে পরাইয়া দিলেন। সারদামহারাজ সেই জীর্ণ

চাদরখানি অমূল্য মনে করিয়া আলমবাজারে লইয়া আসিলেন। সেই সময় গরমকাল, দিনের বেলায় ট্রেনে করিয়া রাজপুতনার মধ্যে দিয়া আসিবার কালে তিনি অজ্ঞান হইয়া গাড়ির ভিতর পড়িয়া যান তাহাতে তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল। তিনি আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া গুজরাট ও অন্যান্য দেশের নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপ সেই জীর্ণ মলিদাখানি কখন মাথায় দিয়া, কখন বা বগলে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। একদিন আলমবাজার মঠের ভিতরদিককার পূর্বদিকের খোলা ছাদে ও শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শশীমহারাজ কৌতুক করিয়া বলিলেন, "আরে সারদা, নরেন তোকে দেয় নাই। আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে তাই তোকে দিয়ে আমায় দিয়েছে।" নিরঞ্জনমহারাজ হাস্য করিতে করিতে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দূঃ শ্যালা, তোকে দেবে কেন রে? তুই শ্যালা বেঁটে, তিন তাল মোহনভোগ খাস, এ কি তোর উপযুক্ত? এ তোকে দেয় নি, শশীকেও দেয় নি, নরেন আমাকে কত ভালবাসে সেই জন্য তোর হাত দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।" এইরূপে সকলে বালকের মত নৃত্য ও আনন্দ করিতে লাগিলেন। জিনিসটি সামান্য হইলেও নরেন্দ্রনাথের ব্যবহৃত জিনিস বলিয়া সকলে এত আনন্দ করিতে লাগিলেন। পরে সেই মলিদা চাদরখানি কি হইল তাহার কোন খবর জানা নাই।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর "কাক চরিত" শিক্ষা—সারদামহারাজ আলমবাজার মঠে আসিয়া যদিও সাধারণের মত কাজকর্ম করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার মাথার একটু ব্যারাম হইল। মাথায় রৌদ্র লাগিলেই কখন তিনি কাঁদিয়া উঠিতেন, কখন চীৎকার করিয়া উঠিতেন, কখন বা রাগিয়া উঠিয়া একটু আধটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন। শশীমহারাজ ও নিরঞ্জনমহারাজ তাহাকে লইয়া বালকের ন্যায় কখন বা কৌতুক করিতেন, কখন বা আবার ধমকাইতেন। এইরূপে মাস

কয়েক যাইবার পর সারদামহারাজের "কাক চরিত" অর্থাৎ কাকেরা কতপ্রকার ডাকে ও তাহার কি অর্থ ও ফল হয় তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া কাক চরিতের ও ফলিতজ্যোতিষ বা গণৎকারের অনেক বই সংগ্রহ করিয়া বাহির বাড়ির এঁদো ঘরটিতে দুয়ার বন্ধ করিয়া সেই সকল পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও একাগ্রতা অদ্ভুত ছিল। তিনি এক মনে সেই অন্ধকার ঘরটিতে বসিয়া সারাদিন কাকের নানা রকম ডাক এবং কোন দিনে কোন মুখে বসিয়া ডাকিলে তাহার কিরূপ অর্থ হয়, কোন গাছের ডালে বসিয়া কিরূপ ডাকিলে তাহারই বা কি অর্থ হয় এই সব অতি মনোযোগসহকারে শিখিতে লাগিলেন। শশীমহারাজ ও কালীবেদান্তী কৌতুক করিয়া সারদামহারাজকে বলিতেন যে, পুকুরের পাড়ে নিমগাছের ডালে বসিয়া কাক ডাকিলে তাহার কি অর্থ হয়, আর সারদামহারাজও পুস্তক লিখিত কাকের ডাক স্মরণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে থাকিতেন। এইরূপে তাঁহাকে লইয়া সকলে কৌতুক করিতেন। কিন্তু তিনি ফলিত জ্যোতিষী ও গণৎকারী বেশ শিখিয়াছিলেন এবং অনেকের ঠিকুজি দেখিয়া ফলাফল বলিয়া দিতেন। ব্যাপারটা যাহাই হউক না কেন সারদামহারাজের অধ্যবসায় অদ্ভুত ছিল। শরৎমহারাজ তাঁহাকে আহ্লাদ করিয়া সারদা নামটা পরিবর্তন করিয়া সারিপুত্র (বুদ্ধদেবের শিষ্য) নামে ডাকিতেন।

প্রায় এক বৎসর পরে সারদামহারাজ দার্জিলিংয়ে যাইয়া সেখানকার উকিল শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ুজ্জে গৃহিণী তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন ; এবং তৎপরিবারে কিছুদিন বাস করিবার জন্য সারদামহারাজকে অনুরোধ করিয়া রাখিলেন। তখন তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছিল। কয়েক মাস পরে তিনি পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর আলমোড়ায় গমন—কলিকাতায় কিছুদিন

থাকিয়া সারদামহারাজ আলমোড়ায় চলিয়া যাইলেন। তথা হইতে ধীরে ধীরে আস্‌কটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার মানস-সরোবরে যাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। আস্‌কটের রাজার বাড়িতে কিছুদিন থাকায় রাজার মাতাঠাকুরাণী এরূপ সাধুর সহিত মানসসরোবর দর্শন করিতে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া যাইবার উদ্যোগী হইলেন; কাজেই সারদামহারাজেরও যাইবার বড় সুবিধা হইল। কিছুদূর যাইয়া বৃদ্ধা রাণীঠাকুরাণী কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু সারদামহারাজের তীর্থ যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় তাঁহার যাইতে বিশেষ অসুবিধা হইল না। আস্‌কট ও আর দুই একটি জায়গা হইতে সারদামহারাজ আলম-বাজার মঠে চিঠি লিখিয়াছিলেন। বহুকালের ঈপ্সিত হর-পার্বতীর বাসস্থান কৈলাস দর্শন করিতে যাইতেছেন—কি আনন্দ—কি উৎসাহ—কি উল্লাস—কি শ্রদ্ধা-ভক্তি—বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে তিনি হরপার্বতী দর্শন করিতে যাইতেছেন; প্রাণের আবেগ, সরল বিশ্বাস, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি—এই সকল ভাবগুলি তিনি চিঠিতে লিখিতেন। যথার্থই তাঁহার চিঠিগুলি অতিশয় হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। তিব্বতের পথের সামান্য জিনিসটিও তাঁহার নিকট মহাপবিত্র বলিয়া বোধ হইত। কয়েক মাস পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বলরামবাবুর বাড়িতে আসিয়া ইংরাজীতে তাঁহার তিব্বতে ভ্রমণ কাহিনী কিছু লিখিয়া তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখা সমাপ্ত হয় নাই।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর ৺পুরীধামে গমন—সারদামহারাজ যখন কোন কার্যে হাত দিতেন তখন তিনি নিজের স্বাস্থ্য, আহার ও নিদ্রা ভুলিয়া যাইয়া সেই কার্যে মাতিয়া যাইতেন। বরাহনগর মঠে অল্পদিন থাকিবার পরই তাঁহাকে বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পিতা অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার ঘোর বৈরাগ্য, সেইজন্য তিনি ৺পুরীধামে চলিয়া যান। সেই সময় তাঁহার পিতার

মৃত্যু হয়, তাহাতে তিনি কোন প্রকার বিচলিত হন নাই। ৺পুরীধামে অবস্থানকালে তিনি বৈষ্ণবভাবে সাধন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ গলায় কণ্ঠি ও বহুমালা এবং তাঁহারই ইষ্টমূর্তি ছোট একটু কাপড়ে বাঁধিয়া গলায় রাখিতেন। পরে একদিন প্রাতে এই অবস্থায় সারদামহারাজ ৩নং গৌরমোহন মুখুজ্জের গলির বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ও আশ্বাস দিয়া বরাহনগর মঠে যাইতে বলিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও ত্রিগুণাতীত স্বামী—নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয় তখন ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে সারদামহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন। তিনি 'ক্যাসেলের' (Cassel) মুদ্রিত ছবিওয়ালা 'সেক্সপিয়ারের' (Shakespeare) গ্রন্থগুলি পড়িয়া নরেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন এবং নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ বোধ করিলে সারদামহারাজকে সেক্সপিয়ারের নানা গ্রন্থ ও কাব্যের বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। বালক সারদামহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট সেক্সপিয়ারের কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও বৈষম্য আছে সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদামহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত। তখন তিনি আর পড়িতে পারিতেন না বইখানি বন্ধ করিয়া স্থির মনে জপ করিতেন। তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন তখনও ঠিক এই রকম এক মন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বিকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদামহারাজের কোন হুঁস থাকিত না। অন্ধকার হইয়া আসিলে আলো জ্বালিয়া আবার পড়িতে বসিতেন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিশেষভাবে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি তিরস্কার, বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গে কখন ধৈর্যচ্যুত হইতেন না। সকল কাজেই তিনি নিষ্ঠা করিয়া করিতেন এবং তাহাই সাধনার পথ, এইটি তাঁহার প্রবল ধারণা।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর মোহনভোগ ভোজন—সারদামহারাজ অপূর্ব-ভাবে গঠিত হইয়াছিলেন। তিনি যেমন অল্প আহার করিতে পারিতেন, আবার তেমনি অধিক আহারও করিতে পারিতেন। কাশীপুরের বাগানে একদিন এক কড়া মোহনভোগ তৈয়ারি হইয়াছিল। বেলা ৪টা বা ৪॥০টার সময় উপস্থিত সকলেই যাহার যেমন ক্ষমতা তদনুযায়ী মোহনভোগ খাইলেন। সকলের খাইবার পরও কড়ায় অনেকটা মোহনভোগ পড়িয়া রহিল। ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে না; এমন সময় দেখা গেল যে একটি খর্বাকৃতি বালক স্কুলের বই হাতে উপস্থিত রহিয়াছে। নিরঞ্জনমহারাজ বালকটিকে শালপাতা করিয়া এক তাল মোহনভোগ খাইতে দিলেন। বালকটি ঠোঁটটি বুজিয়া তখনই মোহন-ভোগটুকু খাইয়া ফেলিল, দাঁত বা মুখ বেশী নাড়িল না। তখন আবার একতাল দিলেন, বালকটি সেটুকুও ঠোঁট বুজিয়া খাইয়া ফেলিল। বালকটি লাজুক ছিল, কথা কহিতে তত ইচ্ছুক নয়। তখন নিরঞ্জন-মহারাজ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, এই বাকী মোহনভোগটুকু খেতে পারিস?" বালকটি মাথা নাড়িয়া সম্মতি প্রকাশ করিল। নিরঞ্জনমহারাজ বলিলেন, "তবে খা দিকিনি?" বালকটিও তৎক্ষণাৎ বাকী সবটুকু খাইয়া ফেলিল।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর বাবুরামমহারাজের মাতার নিকট ভোজন—একদিন সারদামহারাজ ও আর দুই একজনের বলরামবাবুর বাড়িতে বাবুরামমহারাজের মাতার নিকট খাইতে যাইবার কথা ছিল। বাবুরামমহারাজের মাতা তিন জনের মতন রুটি ও কুমড়ার ছোঁকা তৈয়ারি করিয়াছিলেন। কার্যগতিকে সারদামহারাজ ছাড়া কেহই যাইতে পারেন নাই। অগত্যা সারদামহারাজ একাই খাইতে বসিলেন। শরৎমহারাজ ও অন্য কেহ না যাওয়ায় বাবুরামমহারাজের মাতা বকাবকি করিতে লাগিলেন। পাছে রুটি ও তরকারি নষ্ট হইয়া যায় সেইজন্য সারদামহারাজ একাই তিনজনের সমস্ত খাবার খাইয়া ফেলিলেন। বাবুরামমহারাজের বৃদ্ধা মাতা সারদামহারাজের এরূপ

খাওয়া দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, পাছে অসুখ হয়। এইরূপ নানা প্রকার ভয়ে বৃদ্ধা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলেন। পরদিন প্রাতে সারদামহারাজকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহার উদ্বিগ্ন ভাব কমিল। নারীসুলভ স্নেহপূর্ণভাবে বাবুরামমহারাজের মাতা বলিতেন, "সারদা কি খায়রে! ও অনেক পাহাড় পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক মোন্তর শিখেছে তাই উড়ো মোন্তরে উড়িয়ে দেয়, তা না হলে মানুষ কি অত খেতে পারে?"

একসময় সারদামহারাজের মনে কি হইল তিনি আহার কমাইয়া দিলেন। তিনি কয়েক মাস এক ছটাক চাউলের ভাত ও এক ছটাক লঙ্কাবাটা তাহাতে মাখিয়া আহার করিতেন। এইরূপ অল্প আহারে তিনি কয়েক মাস রহিলেন।

মানসসরোবর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সারদামহারাজ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় কয়েকবার লিখিয়াছিলেন। সারদা-মহারাজ যখন তাঁহায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতেছেন সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় বিজয় ও কৃতকার্যের সংবাদ কলিকাতায় আসিল। এই খবর শুনিবামাত্র সারদামহারাজ অপর সকলের সহিত বিশেষ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের উৎসব—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব দক্ষিণেশ্বর ৺কালীবাড়িতে তাঁহার গৃহী-শিষ্যেরা করিতেন। মনোমোহন মিত্র, হরমোহন মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ও রামদয়াল চক্রবর্তী (দয়ালবাবু) প্রভৃতি এ বিষয়ে বলরামবাবুর বাড়িতে বড় ঘরটিতে বসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্যেরা এ সমস্ত বিষয়ে বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন না। উৎসব উপলক্ষে সমস্ত ব্যয়ভার গৃহী ভক্তরা লইতেন এবং উৎসবের পর যে উদ্বৃত্ত হইত তাহা পরবৎসরের জন্য জমা থাকিত। তখনকার কালে এখনকার হিসাবে লোকজন খুবই কম হইত অর্থাৎ এক শত হইতে পাঁচ শত পর্যন্ত লোক হইত। তখনকার দিনে ঐ ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশ অতি আনন্দপ্রদ ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের উৎসবের ভার

সারদামহারাজ নিজে সমস্ত লইলেন। এই বৎসর হইতে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইতে লাগিল; সারদামহারাজ গৃহীভক্তদের কর্মে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে স্বাভাবিক অধ্যবসায় ও অমানুষিক পরিশ্রমসহকারে সর্বত্র যাতায়াত করিতে লাগিলেন। অন্যান্য গৃহীভক্তরা দয়ালবাবুর সহিত মিলিত হইয়া "হোর মিলারের" জাহাজ ভাড়া করিয়া লইলেন। রাস্তার চারিদিকে বড় বড় প্লাকার্ড দড়ি দিয়া বাঁধিয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইল। কীর্তন ও অপর সকল বাদ্য সম্প্রদায়কে নিমন্ত্রণ করা হইল। পত্র ছাপাইয়া সর্বত্র ভদ্রলোকদিগের বাড়িতে পাঠান হইল। প্রসাদেরও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মন্দিরের দক্ষিণদিকের বাগানে রন্ধনশালা হইল এবং তাহার সন্নিকটস্থ গৃহাদি ভাণ্ডার করা হইল।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রসাদ ভোজন—এই বৎসরের উৎসবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অনেক ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত ছিলেন এবং সুবিখ্যাত এন, ঘোষও গিয়াছিলেন। ৺কালী মন্দিরের সম্মুখে 'নাটমন্দিরে' কালী কীর্তন হইতে লাগিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তখন ব্রাহ্মসমাজের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মাথায় জটা হইয়াছিল, কণ্ঠে, অনেক মালা ধারণ এবং গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছিলেন। হুট্‌কো গোপাল ও বর্তমান লেখকের প্রতি গোস্বামীমহাশয়ের লোকদিগের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। গোস্বামী মহাশয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, "নগেন, চল মা জগদম্বাকে প্রণাম করে আসি" এই বলিয়া তিনি সকলকে লইয়া ৺কালীমন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইলেন। গোস্বামী মহাশয় ৺কালীমন্দিরে ঢুকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং অপর সকলে নিজ নিজ ইচ্ছামত শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইতে লাগিলেন তাহার পর মন্দিরের উঠানে বসিয়া সকলে প্রসাদ পাইলেন। নানা শ্রেণীর পুরুষ ও পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরাও একসঙ্গে প্রসাদ পাইলেন। এইবারই প্রথম দেখা গেল যে সকল বর্ণের লোক একসঙ্গে প্রসাদ পাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দুইজন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ প্রসাদ পাইতেছিলেন;

একজন প্রসাদ পাইবার পর অপরকে বলিলেন, "এটা কেমন হলো হে? গঙ্গার ধার, কৈবর্তর বাড়ি, উনছত্রিশ জাত একসঙ্গে বসে অন্ন খেলাম। আমি ত কখন অপরের ছোঁয়া-লেপা অন্ন খাইনি, কিন্তু আজ ত এই ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া-লেপা অন্ন খেলাম। কি রকম হলো বল দিকিনি?" অপর ব্রাহ্মণটি বেশ ভক্তিমান লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, খেতে কি আপনার কোন দ্বিধা হয়েছিল?" প্রথম ব্যক্তিটি বলিলেন, "তা হলে খেলাম কেন?" দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলিলেন, "কি জানেন এটা এ যুগের শ্রীক্ষেত্র—এ মহাপ্রসাদ—ইহাতে কোন জাতিভেদ নাই এবং উচ্ছিষ্টও হয় না।" প্রথম ব্যক্তিটি পরম আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক বলেছ, এই কথাটাই ঠিক! এখন আমার মনের সন্দেহ গেল।"

মুসলমান স্ত্রীলোকদের উৎসব দর্শন—জাহাজ যখন বহু সংখ্যক নিশান উড়াইয়া ভরাভর্তি লোক লইয়া ঘাটে আসিতে লাগিল তখন সকলেই উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রতিবাসী মুসলমান স্ত্রীলোকেরা ছোট ঘাটটিতে জল লইতে আসিয়া কলসী কাঁখে করিয়া জনসংখ্যা ও বহু নিশান-উড়ান জাহাজ দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন প্রবীণা অপর একজনকে বলিতে লাগিল, "ওগো জান, সেই গদাই ঠাকুর! গঙ্গার পাড়ে বসে···করতো আর কাঁদতো। পাগলার ছেলেপুলে ছিল না তাই এখন জাহাজ ভরে সব ছেলেরা আসচে।" স্ত্রীলোকটি কথাগুলি এমন মিষ্টভাবে বলিয়াছিল যে সেই শুনে সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

ব্রহ্মবাদিন ও উদ্বোধন পত্রিকা—এই সময় স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। মাদ্রাজে "ব্রহ্মবাদিন" নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার কথাবার্তা হইতে লাগিল এবং কলিকাতায়ও একখানি পত্র প্রকাশের কথা হইতে লাগিল। গুপ্তমহারাজ উর্দু জানিতেন, তিনি উর্দু পত্র লিখিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু

অধ্যবসায়ী সারদামহারাজ নিজেই এই সংবাদপত্রের ভার লইয়া কার্য আরম্ভ করিলেন। তিনি অতি কঠোর পরিশ্রম করিয়া "উদ্বোধন" পত্রিকা প্রকাশ করেন। বর্তমান লেখক এই সময় উপস্থিত ছিলেন না সেইজন্য সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন।

ত্রিগুণাতীত স্বামীর আমেরিকায় গমন—১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া সহরে যাত্রা করেন এবং তথায় স্যানফ্রান্সিস্কো নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। কিছুকাল তিনি তথায় প্রচার কার্য করিবার পর জনৈক পাগল তাঁহাকে বোমা দ্বারা আঘাত করে এবং তাহাতে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হইয়া কিছুদিন পরে দেহত্যাগ করেন।

অভেদানন্দ স্বামীর আত্মনির্ভর ভাব—একদিন বেলা ৯-৩০ বা ১০টার সময় আলমবাজার মঠের রান্নাঘরের ছাদের উপর সিঁড়ির দরজার সম্মুখে গরাদের কাছে কালীবেদান্তী দাঁড়াইয়া আছেন। কখন কাঠের গরাদের ভিতরে হাত দিতেছেন, কখন বা গরাদের উপর হাত দুটি রাখিতেছেন। ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘরের কাছে অনেকে বসিয়া কুটনো কুটিতেছিল। কথাপ্রসঙ্গে বলরামবাবুর কথা উঠিল। তখন বলরামবাবুর দেহত্যাগ হইয়াছে। সকলেই বলরামবাবুর খুব সুখ্যাতি করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ বাবুরামমহারাজ কথা উঠাইলেন যে, বলরামবাবু মঠে অনেক সাহায্য করিতেন এইজন্য তাঁহার প্রতি সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। এই ভাবেব কথা সকলেই কহিতে লাগিলেন। কালীবেদান্তী গরাদের নিকট দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া সকলের কথা শুনিতেছিলেন। তিনি কথাবার্তায় প্রথমে যোগদান করেন নাই। তাহার পর একটু বিরক্ত ও দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ, বলরামবাবু তাঁহার ভক্ত ও আশ্রিত সেইজন্য আমাদের সকলের বলরামবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মান দেখান উচিত; কিন্তু দু'মুঠো কে অন্ন দিয়েছে তার জন্য আমি কারুর কাছে মাথা হেঁট করতে পারি না। তোদের হচ্ছে কি না 'অন্নদাতা ভয়ত্রাতা'। দু'মুঠো কে

অন্ন দিয়েছে তার কাছে জোড়হাত করে থাকবি, তার সুখ্যাতি করবি, তার খোসামোদ করবি—যাতে পরে সে আবার ভাত দেয়। আমি সন্ন্যাসী—দু'মুঠো ভাতের জন্য মাথা হেঁট করতে পারি না। দু'মুঠো ভাত বা দু'খানা রুটি, এ দোরে না দেয়, ও দোরে দেবে, সে দোরেও না দেয় "ত" তৃতীয় দোরে দেবে; তা বলে দুটি ভাতের জন্য কারো নিকট মাথা হেঁট করতে পারি না।" এইভাবের কথা বলিতে লাগিলেন। কথাটা বাবুরামমহারাজের উপর লক্ষ্য করিয়া হইতে লাগিল।

কালীবেদান্তী তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এমনভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। কালীবেদান্তী যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা লোক সকলেই সেদিন বেশ বুঝিতে পারিলেন। কালীবেদান্তীর সহিত যদি কাহারও কোন কথা না মিলিত তাহা হইলে তিনি স্পষ্টভাবে তাহার মুখের উপর বলিয়া দিতেন, কোনরূপ দ্বিধা করিতেন না। এই স্বাধীনচেতা আত্মনির্ভরশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবগুলি কালীবেদান্তীর জীবনে বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। এই সময় কালীবেদান্তীর তীব্র বৈরাগ্য-ভাব ছিল।

হৃদয় মুখোপাধ্যায় কথিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্দেশ খাওয়ার কাহিনী—যেদিন হৃদু মুখুজ্জ্যে শিবানন্দস্বামীর সহিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও কেশববাবুর কথা কহিয়াছিলেন, সেদিন তিনি নিম্নলিখিত বিশেষ ঘটনাও বলিয়াছিলেন, "একদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে গেছে। বিকেলে মামাকে জলখাবার জন্য গুটিকতক সন্দেশ দিয়েছে। মামা কোন জিনিস নিবেদন না করিয়া খাইতেন না এবং অগ্রভাগও কাহাকে দিতেন না। কিন্তু সেদিন নরেনকে আগে সন্দেশ খাওয়াইয়া পরে তিনি নিজে খাইলেন। এই কাজ দেখে ত আমি চমকে উঠলুম এবং নহবতখানার উপরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ছিলেন তাঁকে বলিতে তিনিও চমকে উঠলেন। কারণ মামা আগে থেকেই বলেছিলেন 'ত্যাখ্ যখন আমি খাবারের আগ্‌ভাগ অপরকে দিয়ে পরে আমি খাব তখন জানবি যে আমার দেহ আর বেশী দিন থাকবে না'। একথা আমি ও শ্রীশ্রীমাতা-

ঠাকুরাণী জানতেন, তাই আমরা এত চঞ্চল হয়ে পড়লুম। সত্যি সত্যিই তাই হলো, কয়েক বৎসর পরই মামার দেহ গেল।"

স্বামী সারদানন্দ ও বর্তমান লেখক—শরৎমহারাজ উত্তরাখণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাশয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, শরীর কৃশ ও দুর্বল। একদিন প্রাতে চা পান করিয়া বর্তমান লেখক ও শরৎমহারাজ আলমবাজার মঠ হইতে পায়চারি করিতে করিতে বরাহনগর বাজারের নিকট চলিলেন। পথে রাধামঞ্চের কাছে একজন লোক একখানি খাঁড়া শানাইতেছিল। বর্তমান লেখক খাঁড়া দেখিয়া বলিলেন, "বলি করা ঠিক নয়।" শরৎমহারাজ বলিলেন, "কেন মাংস খেতে পার আর বাড়িতে বলি করিলেই যত দোষ।" বর্তমান লেখক বলিলেন, "মাংস খাওয়া এক ভাবের আর ধর্মের নামে জীব হত্যা করা অন্য ভাবের, ধর্মটা হচ্ছে দয়া—সকলের প্রতি ভালবাসা থেকে উৎপত্তি। দয়া, ভালবাসা যত বাড়ে, ধর্মের মাহাত্ম্যও সেইভাবে বাড়ে। কিন্তু ধর্মের নাম করে আর একটা জীবের প্রাণ নাশ করা—ইহা ভাল নয়। একটা জীব প্রাণরক্ষার জন্য যখন ব্যা ব্যা কচ্ছে তখন লোকের মনে কোথায় ভক্তি থাকে? কোথায় ভালবাসা থাকে? মাংস খাওয়া সে ত শরীরের কার্য, এর সঙ্গে ধর্মের কি সম্পর্ক আছে? পশুবধ করবার জন্য ত স্বতন্ত্র স্থান আছে, সেখানে করিলেই ত হয়; ধর্মের নাম দিয়া অপরের প্রাণ নাশ করিবার কি আবশ্যকতা আছে?" শরৎমহারাজ বলিলেন, "ধর্মের সঙ্গে বলির সম্পর্ক আছে, শাস্ত্র বলে 'দেবার্থে পশু হননম্'। শাস্ত্রে যেরূপ আছে তার খানিকটা ইচ্ছামত বাদ দিয়া ধর্ম করিতে গেলে ধর্ম বিপর্যস্ত হতে পারে। এইজন্য কোন অংশ বাদ দেওয়া উচিত নয়, পশুবলিরও আবশ্যকতা আছে।" শরৎমহারাজ যদিও মুখে শাস্ত্র সমর্থন করিয়া তর্ক করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছিল যে তখন তিনি পশুবলি পছন্দ করিতেছিলেন না, তবে শাস্ত্রমর্যাদা রাখিবার জন্য এত যুক্তি দেখাইতেছিলেন। যাহা হউক এই কথা বলিতে বলিতে দুইজনায়

বরাহনগর বাজারে আসিলেন। তখন তিনি ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, সেইজন্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে পায়চারি করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

সান্যাল মহাশয় কথিত নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের হিমালয় ভ্রমণকালে বিপদ—একসময় নরেন্দ্রনাথ ও কয়েক জনে মিলিয়া হিমালয়ের কোন উচ্চস্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা তথায় বরফ বৃষ্টি হইতে লাগিল। গুর্জর বা ভেড়াওয়ালারা পাকদণ্ডি বা পাহাড়ি পথ দিয়া পলায়ন করিল। যুবক সন্ন্যাসী কয়েকটি পথ স্থির করিতে না পারিয়া শিলাবৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলেন। গাত্রে বস্ত্রাদিও বিশেষ কিছু ছিল না—মৃত্যু অনিবার্য। এইরূপ বিপদ দেখিয়া সকলেই স্থির করিলেন যে, ভালই হইয়াছে—দেহত্যাগ করা যাইবে। পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে নিকটে একটি গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতরে সকলে গিয়া ধ্যান করিতে বসিলেন এবং ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিবেন এরূপ স্থির করিলেন—মৃত্যু সম্মুখে। সান্যাল মহাশয়ের নিকট তখন কিছু কাল-মরিচ বা গোল-মরিচ ছিল। তিনি সেইগুলি বাহির করিয়া সকলকে দিলেন। সকলেই সেইগুলি চিবাইয়া খাইয়া একটু গরম হইলেন। যাহা হউক, সেই রাত্রে সকলের কোনক্রমে জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

সারদানন্দ স্বামী কথিত তাঁহার হিমালয় ভ্রমণ—শরৎমহারাজ একবার হিমালয় ভ্রমণ করিতে করিতে পাহাড়ের কোনস্থানে যাইয়া উপস্থিত হন এবং তথায় এক গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষা করেন। শরৎমহারাজের তখন জ্বলন্ত বৈরাগ্য, তিনি গৃহস্থদিগকে বলিলেন, রুটি লইয়া তিনি আপনমনে নদীর ধারে বসিয়া ভোজন করিবেন। গৃহস্থ তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তদ্রূপই ব্যবস্থা করিলেন। শরৎমহারাজ নদীর ধারে বসিয়া আহার করিয়া থালা-ঘটিগুলি স্বহস্তে মাজিয়া লইয়া আসিয়া গৃহস্থকে ফিরাইয়া দিলেন। সেই গৃহস্থের একটি অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ ছিল। সে সাধু দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া সরলভাবে

হাসিতে হাসিতে শরৎমহারাজকে বলিল, "মহারাজ, আপনি কষ্ট করিয়া কেন থালা-বটি মাজিয়া আনিলেন? নদীর ধারে থাকলেই হইত, আমি এক সময় গিয়া মাজিয়া আনিতাম।" শরৎমহারাজ বলিলেন, "অপরে যে চুরি করিয়া লইবে?" এই কথা শুনিয়া সরল পাহাড়ী মেয়েটি বলিয়া উঠিল, "কেন, একজনের জিনিস অপরে নেবে কেন? আমাদের দেশে অমন করে কেউ কারও জিনিস তো নেয় না।" শরৎমহারাজ বলিতেন যে, মেয়েটির মুখে ও কথাবর্তায় এমন একটা দেবভাব ছিল যে, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে।

এই সময় বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় ও কয়েকজনে মিলিয়া "বদ্রীনারায়ণতীর্থ" দর্শন করেন। সম্ভবতঃ কালীবেদান্তীও এই সঙ্গে ছিলেন, কারণ তিনি উত্তরাখণ্ড হইতে ভূর্জপত্রে লিখিয়া আলমবাজার মঠে কয়েকখানি পত্র দিয়াছিলেন।

দীনমহারাজ কথিত কাশী পরিক্রমা—একবার ৺কাশীতে অভেদানন্দ স্বামী, তুলসীমহারাজ ও দীনমহারাজ তিনজনে মিলিয়া পরিক্রমা করিতে বাহির হইলেন। তিনজনের হাতে কমণ্ডলু। গ্রাম হইতে একজন দই লইয়া আসিয়া তাঁহাদের দই লইবার জন্য অনেক অনুনয় করিল। প্রথমে সকলেই লইতে অনিচ্ছুক হইলেন, কারণ সঙ্কল্প-করা বস্তু; অর্থাৎ লোকটি সঙ্কল্প করিয়াছে যে সাধুদের দই খাওয়ালে তার অভিষ্ট বস্তু লাভ হইবে, এই জন্য সকলেই অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু আহারের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় অবশেষে কমণ্ডলুতে সকলেই দই লইলেন। চলিতে চলিতে ক্রমেই বেলা হইতে লাগিল। অভেদানন্দ ও তুলসীমহারাজ উভয়েই বলবান, তাঁহারা আগে আগে চলিতে লাগিলেন। দীনমহারাজ পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন ও একমনে জপ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। ক্রমেই জপ গভীর হইতে লাগিল এবং তাঁহার গতিও শ্লথ হইয়া পড়িল, অবশেষে এক জায়গায় হাত পা আর চলিল না—স্থির হইয়া রহিলেন। তখন দীনমহারাজ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে জগৎ চূর্ণ হইল—হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া

গলিয়া গিয়াছে। আদান-প্রদান, আকাঙ্ক্ষা বা অন্য কোন ভাব আর কিছুই নাই। সমস্ত স্থির ও নিস্পন্দ—আনন্দ বা নিরানন্দ তথায় কিছুই নাই। শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁহার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দারু পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সমাধি যে কি জিনিস তাহা তিনি এই সময় প্রথম উপলব্ধি করিলেন কিছুক্ষণ পরে দীন-মহারাজ শুনিলেন যে অভেদানন্দ স্বামী ও তুলসীমহারাজ উভয়ে দূর হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বুড়ো শ্যালা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? শ্যালা মোলো না কি?" তাহার পর একটু সংজ্ঞালাভ করিয়া আবার সকলে চলিতে লাগিলেন। বেলুড় মঠে সন্ধ্যার পরে দীনমহারাজ যখন তাঁহাদের কাশী পরিক্রমা ও সমাধির কথা বলিতেন তখন তাঁহার মন এত উঁচুতে উঠিয়া যাইত যে বক্তা ও শ্রোতা বহুক্ষণ সে তেজঃপুঞ্জ ভাব সহ্য করিতে পারিতেন না।

৺কাশীধামে অভেদানন্দ স্বামীর হাস্য কৌতুক—৺কাশীধামে নব্বই বৎসরেরও অধিক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। চক্ষু নাই, কেবল শ্বাস-প্রশ্বাস আছে। সকালে তাহাকে বাহিরে বাহির করিয়া একখানি পিঁড়েতে বসাইয়া আর একখানি পিঁড়ে পিঠে ঠেস্ দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া তাঁহার আত্মীয়েরা চলিয়া যাইতেন। কুলীন ব্রাহ্মণ, বহু বিবাহ করিয়াছিলেন এবং নামগুলি পাছে বিস্মৃত হন, সেইজন্য একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধের বিবাহ মানে ছিল অর্থ উপার্জন। কালীবেদান্তী ও অপর সকলে যাইয়া সেই জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধকে বলিতেন, "একটা বে করবে? ভাল সম্বন্ধ আছে।" বৃদ্ধ ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে বলিতেন, "কত দেবে?" তাহা শুনিয়া সকলে সময়োপযোগী গালিগালাজ দিয়া তাঁহাকে বলিতেন, "খাট দেবে, কাঠ দেবে, প্যাকাটি দেবে।" কিন্তু বৃদ্ধটি শুনিতে না পাইয়া পুনঃপুনঃ বলিতেন, "কত দেবে?" আর কালীবেদান্তী এবং অন্যান্য ব্যক্তিরাও বলিতেন, "খাট দেবে, কাঠ দেবে, পাঁকাটি দেবে।" আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া আসিয়া কালীবেদান্তী কিছুদিন এই কথা লইয়া কৌতুক রহস্য করিতেন।

৺কাশীধামে স্বামী ভাস্করানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দ—৺কাশীধামে অবস্থানকালে কালীবেদান্তী ৺দুর্গাবাড়ির নিকট স্বামী ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে যান। স্বামী ভাস্করানন্দজী তখন উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন এবং প্রসিদ্ধ সাধু বলিয়া সর্বত্র পূজিত হইতেন। কালীবেদান্তীর তখন মহাবৈরাগ্যভাব, বয়স যদিও অল্প কিন্তু বিশেষ পণ্ডিত হইয়াছিলেন ও কঠোর তপস্যা করায় ভিতরে একটা নির্ভীক বৈরাগ্যের ভাব ও শক্তি জাগ্রত হইয়াছিল। কালীবেদান্তী, বৃদ্ধ-সর্বপূজিত স্বামী ভাস্করানন্দজীর সহিত সমানভাবে তর্ক করিয়াছিলেন এবং অনেক সময় তর্কে বৃদ্ধ স্বামী ভাস্করানন্দজীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৺কাশীধামে অবস্থানকালে কালীবেদন্তী একটা বাগানে পড়িয়া থাকিতেন ও কঠোর তপস্যা করিতেন। এলাহাবাদে, ঝুসিতে ও গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়িতে কালীবেদান্তী কিছুদিন ছিলেন। এইস্থানে তিনি খুব কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। রাত্রে যখন ধ্যান করিতে বসিতেন তখন ধ্যান এত গভীর হইত যে, যখন ওপারের কেল্লাতে শেষ রাত্রে তোপ পড়িত তখন তাঁহার চৈতন্য হইত যে রাত্রি পোহাইয়া গেল।

অভেদানন্দ স্বামীর হিমালয় ভ্রমণ—হৃষিকেশে কালীবেদান্তী এক কুটিরে বা কুশ ঘাসের ঘরে (উটজ) থাকিতেন এবং কম্বুলিবাবার ছত্র হইতে রুটি আনিয়া গঙ্গার কিনারায় এক অশ্বত্থগাছের তলায় যাইতেন এবং তথায় অনেক পাথর পাতা ছিল সেই পাথর ধুইয়া তাহাতে রুটি রাখিয়া খাইতেন ও আহারান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়া জপ-ধ্যান করিতেন। বর্তমান লেখক যখন প্রথমবার হৃষিকেশ যান তখন সেই অশ্বত্থগাছটি দেখিয়াছিলেন ও তাহার তলায় বসিয়া থাকিতেন। এক্ষণে সেই গাছটি জলে ভাসিয়া গিয়া সেই স্থানটি একটি ছোট চড়ায় পরিণত হইয়াছে। একটি হিন্দুস্থানী সাধু তথায় বসিয়া গীতা পাঠ করিতেন এবং ব্যাখ্যা করিতেন যে, 'স্থানে হৃষিকেশ' অর্থাৎ হৃষিকেশই হচ্ছে একমাত্রস্থান। আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া কালীবেদান্তী সাধুটির নানারকম কথাবার্তা ভাবভঙ্গি দেখাইয়া কৌতুক রহস্য করিতেন।

রাজপুতনায় অভেদানন্দ স্বামী ও অখণ্ডানন্দ স্বামী—হৃষীকেশ ও অন্যান্য স্থান পর্যটন করিয়া কালীবেদান্তী রাজপুতনায় যান এবং তথায় গঙ্গাধরমহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কালীবেদান্তী গঙ্গাধর-মহারাজকে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া যাইতে অনেক অনুরোধ করেন। কারণ গঙ্গাধরমহারাজ কয়েক বৎসর বাঙ্গালা দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছিলেন এবং তাঁহার আলমবাজার মঠে ফিরিবার কোনই ইচ্ছা ছিল না। রাজপুতনায় অবস্থানকালে কালীবেদান্তী আজমীড় ও পুষ্কর যান। পুষ্করের জলে স্নান করিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার নাহারু বা (tape worm) রোগ উৎপন্ন হয়।

অভেদানন্দ স্বামীর গুজরাট ভ্রমণ—নানাস্থান পর্যটন করিয়া কালী-বেদান্তী অবশেষে গুজরাটের দ্বারকা ও বেট দ্বারকায় যান। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি এক ওয়াঘির বা জঙ্গলি দস্যু দেখিয়াছিলেন। ওয়াঘির এক জাতীয় লোক, যাহারা চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে। দেখিতে অতিশয় বলিষ্ঠ ও ভীষণ সাহসী—এক প্রকার বন্যপশু বিশেষ। একবার এক ওয়াঘির ধৃত হইয়া জেলে যায়। কিছুদিন পরে জেলের সিপাহীর তরোয়ালখানি কাড়িয়া লইয়া প্রাচীর টপ-কাইয়া সহরে চলিয়া আসে। বাজারের মাঝে খোলা তরোয়ালখানি পার্শ্বে রাখিয়া বসিল এবং ক্ষৌরকারকে দাড়ি মুড়াইয়া দিতে আদেশ করিল। ওয়াঘির দেখিতে জনতা অধিক হইল এবং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেক পুলিশের লোকও জমায়েৎ হইল কিন্তু কাহারও সাহস হইল না যে, ওয়াঘিরকে ধৃত করে। নির্ভীক ওয়াঘির ক্ষৌর হইয়া স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

অভেদানন্দ স্বামীর বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভ্রমণ—তাহার পর কালী-বেদান্তী বোম্বাই পর্যটন করিতে যান। বোম্বাইয়ে খাবারের দোকানে গিয়া তিনি কিছু খাবার কিনিতে চাহিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের বাইশ তোলা সের না জানা থাকায় তিনি একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। হালুইকর বিদেশী লোক বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দেন।

বোম্বাই হইতে তিনি মাদ্রাজের দিকে যান এবং দক্ষিণী ভাষা না জানায় তাঁহাকে অনেক সময় কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। ইংরাজী জানা লোক মারফৎ দ্রব্যাদি ক্রয় বা লোকের সহিত কথাবার্তা কহিতে হইত। মাদ্রাজ হইতে জাহাজে করিয়া তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। জাহাজে খাইবার জন্য তিনি চিঁড়া, গুড়, দই এই সব জিনিস লইয়াছিলেন। অনভিজ্ঞতাবশতঃ চিড়াগুলি সমুদ্রের জলে ধুইয়া লইয়াছিলেন, সেইজন্য তাহা এত তিক্ত হইয়া গিয়াছিল যে আহার উপযোগী আর রহিল না। অবশেষে তিনি আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। কালীবেদান্তী কতবার তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন এবং কোন্‌বার কোথায় তাঁহার কি ঘটনা হইয়াছিল তাহা বিশেষ স্মরণ নাই। তবে যাহা কিছু উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম তাহাই সন্নিবেশিত হইল।

স্বামী নির্মলানন্দের ভ্রমণ—তুলসীমহারাজ একবার পদব্রজে জামতাড়ার ভিতর দিয়া ৺কাশীধামে যাইতেছিলেন। সম্ভবতঃ কালী-বেদান্তীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পথে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়, গ্রাম বা লোকালয় কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না। অবশেষে এক বৃদ্ধা সাঁওতাল স্ত্রীলোক তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করায় বৃদ্ধা সাঁওতাল রমণী যুবক সন্ন্যাসীদ্বয়কে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "কথ্যাকে যাবি, দিহাতকে যাবি না জামাতড়াকে যাবি।" অবশেষে তাঁহারা পথ স্থির করিয়া স্থানীয় রাজা বা সাঁওতাল জমিদারের বাড়িতে সে রাত্রি যাপন করেন। তুলসীমহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিন পর্যন্ত এই কথাটি লইয়া কৌতুক রহস্য করিয়াছিলেন।

অখণ্ডানন্দ স্বামীর ভ্রমণ—সম্ভবতঃ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার প্রথমে রবিবার গঙ্গাধরমহারাজ নরেন্দ্রনাথের সহিত তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হন। প্রথমে দেওঘরে গিয়াছিলেন। তথায় সুবিখ্যাত রাজনারায়ণবাবুর সহিত তাঁহাদের নানাবিষয় কথাবার্তা হইয়াছিল। তাহার পর গঙ্গাধরমহাজ পশ্চিমের নানাস্থান ও উত্তরাখণ্ডের পার্বতীয়

দেশ পর্যটন করিয়া অবশেষে মীরাটে আসিলেন। এইখানে নানাস্থান হইতে সকলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। মিরাট হইতে আবার সকলে পৃথক হইয়া যান। গঙ্গাধরমাহারাজ রাজপুতনার দিকে গমন করেন। জয়পুরের অন্তর্গত খেতড়ি রাজ্যের রাজা অজিত সিংহের কাছে তিনি কিছুদিন ছিলেন। রাজা অজিত সিং গঙ্গাধরমহারাজকে খুব যত্ন করিয়া কিছুদিন রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজপুতনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি রাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং উদয়পুরেও একবার গিয়াছিলেন।

অখণ্ডানন্দস্বামীর গুজরাট ভ্রমণ—রাজপুতনা হইতে তিনি গুজরাটে যান। গুজরাটের কোন সহরে তিনি এক কবিরাজের বাড়িতে বাস করিতেন। গঙ্গাধরমহারাজ বড় চা-প্রিয় ছিলেন এবং অধিক পরিমাণে বহুবার চা পান করিতে পারিতেন। সহরে বাস করিবারকালে এক ধনী ব্যক্তির সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। তিনি যুবা গঙ্গাধরমহারাজকে খুব স্নেহ করিতেন এবং তাহার কাছে আসিয়া চা পান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সরল গঙ্গাধরমহারাজ বিভবশালী ব্যক্তির নিকট চা পান করিতেন ও ধর্ম বিষয়ে নানা কথাবার্তা কহিতেন। অবশেষে বৃদ্ধের ইচ্ছা হইল যে পুত্রের হাতে সমস্ত বিষয় দিয়া তিনি তীর্থে গিয়া বাস করিবেন। কিন্তু তাহার দুষ্টা পুত্রবধূ মনে করিল যে বৃদ্ধ এই সাধুটিকে অনেক বিষয় দিয়া দিবে। ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া সেই পুত্রবধূ একদিন গঙ্গাধরমহারাজের চায়ের বাটিতে অল্প পরিমাণে বিষ দিয়াছিল।

অখণ্ডানন্দস্বামীর চায়ের সহিত বিষ খাওয়া—গঙ্গাধরমহারাজ চা পান করিয়া শরীর অসুস্থ বোধ করায় শীঘ্র কবিরাজের বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অনবরত ভেদ হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় রোগ বুঝিতে পারিয়া ঔষধ দিয়া পীড়া উপশম করিলেন এবং গঙ্গাধরমহারাজকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া দিলেন যে, যেন তিনি আর কাহারও বাড়ি গিয়া চা পান না করেন। চা, দুধ,

টিনি যাহা আবশ্যক হইবে তাহা সমস্তই তিনি আয়োজন করিয়া দিবেন। কিন্তু ভিতরকার কথা কবিরাজ মহাশয় কিছু বলিলেন না। কয়েক সপ্তাহের পর গঙ্গাধরমহারাজ আবার বৃদ্ধের বাড়িতে গিয়া চা পান করিতেন থাকেন। পুনরায় সেই দুষ্টা পুত্রবধূ চায়ের সহিত বেশী পরিমাণে বিষ মিশাইয়া দিয়াছিল। চা পান করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া গঙ্গাধরমহারাজ শরীর অসুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং অনবরত ভেদ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ বিষের অন্যান্য চিহ্নও প্রকাশ পাইল এবং ভয়ের কারণ দেখা যাইতে লাগিল। এই সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় ভীত হইলেন এবং গঙ্গাধরমহারাজের জীবন সঙ্কটাপন্ন ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গঙ্গাধর-মহারাজ অনেক কষ্টে সে যাত্রায় রক্ষা পাইয়া দুর্বল ও রুগ্ন হইয়া কয়েক মাস কবিরাজ মহাশয়ের বাড়িতে রহিলেন। কবিরাজ মহাশয় তখন বিষ প্রয়োগের সমস্ত কথা গঙ্গাধরমহারাজকে বলিলেন। ধনী বৃদ্ধ ঐ সকল কথা শুনিয়া পুত্রবধূকে বিশেষ ভৎ'সনা ও অভিসম্পাৎ করিতে লাগিলেন।

অখণ্ডানন্দস্বামীর ডাকাতের হাতে পড়া—কবিরাজ মহাশয়ের বাড়িতে কিছুদিন থাকিয়া গঙ্গাধরমহারাজ অন্যত্র চলিয়া যান। নরেন্দ্রনাথের এই সময় তীব্র বৈরাগ্য, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতেন না। পাছে পূর্ব পরিচিত কোন ব্যক্তি নিকটে আসে এবং মনকে বৈরাগ্য হইতে ভ্রষ্ট করে সেইজন্য সর্বদাই তিনি একাকী থাকিতে ইচ্ছা করিতেন। গঙ্গাধরমহারাজ বালকস্বভাব, নরেন্দ্রনাথকে অনেক দিন দেখেন নাই সেইজন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। তিনি যে যে স্থানে যাইলেন তথায় গিয়া শুনিলেন যে নরেন্দ্রনাথ তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি এক মরুস্থলের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিল যে তৎস্থানে মন্বন্তর হইয়াছে, আহার্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য এবং ডাকাতেরা দলে দলে বাহির

হইয়া লুঠতরাজ করিতেছে। গঙ্গাধরমহারাজ তাহাদের নিষেধ না শুনিয়া বহির্গত হইলেন, সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল ও এক পুঁটলি বই। যাইবার সময় গ্রামবাসীরা গঙ্গাধরমহারাজকে তদ্দেশীয় ভাষায় "আমি সাধু" ইত্যাদি দু'একটি কথা শিখাইয়া দিয়াছিল। কয়েক মাইল যাইবার পর একসময় ডাকাত আসিয়া তাঁহাকে ঘেরোয়া করিল। কেহ কাহারও ভাষা জানে না। ডাকাতেরা তর্জন গর্জন করিতে লাগিল, জিনিস পত্তর সব কাড়িয়া লইল এবং পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল যে তাহার ভিতর 'নোট' আছে কি না এবং অল্প বিস্তর ভয় দেখাইয়াছিল। অবশেষে ডাকাতেরা গঙ্গাধরমহারাজকে এক গাছের সহিত পেছন দিকে হাত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইল। গঙ্গাধর-মহারাজ তখন আকার ইঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন, 'আমায় মেরে ফেল কিন্তু বাঁধিও না।' যাহা হউক, ডাকাতেরা তো বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। এদিকে বৈকাল হইয়াছে, সন্ধ্যা হইলে ডাকাতের সর্দারের মনে একটু দয়ার উদয় হইল। গুজরাটের ঐ স্থানে বন্য সিংহের ভয় আছে, রাত্রে বন্য জন্তু আসিয়া লোকটাকে খাইয়া যাইতে পারে এই ভাবিয়া ডাকাতের সর্দার আবার ফিরিয়া আসিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল এবং প্রণাম ও অনেক মিনতি করিতে লাগিল। অবশেষে গঙ্গাধরমহারাজকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্তী এক নগরের দিকে চলিল। নগর দূরে দেখা যায় এইরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া ডাকাতের সর্দার গঙ্গাধর মহারাজকে নগরে যাইতে বলিল। গঙ্গাধরমহারাজ তাহাকে নগর পর্যন্ত যাইতে বলায় পুলিশ তাহাকে ধৃত করিবে এই বলিয়া ডাকাতের সর্দার চলিয়া যাইল।

অখণ্ডানন্দ স্বামীর আলমবাজার মঠে পুনরাগমন—রাজপুতানা ও গুজরাটে অবস্থানকালে তাঁহার কালীবেদান্তী ও তুলসীমহারাজের সঙ্গে দেখা হয়। ইঁহারা দুইজনে আলমবাজারের মঠে ফিরিয়া যাইতে অনুনয় করায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের উৎসবের পূর্বে গঙ্গাধরমহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং খেতড়ির

রাজা অজিত সিংহের কথা, গুজরাট ও অন্যান্য স্থানের বিষয় তিনি বলিতে লাগিলেন।

প্রয়াগে যোগানন্দ স্বামীর বসন্ত রোগ—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যোগেন-মহারাজ পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রয়াগে সন্ন্যাসী অবস্থায় ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করেন। কিছুদিন পরে যোগেনমহারাজ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দবাবু জানিতে পারিলেন যে যোগেনমহারাজ পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য এবং তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ, ধর্মপ্রসঙ্গ ও পরমহংস-দেবের নানা কথাবার্তায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গোবিন্দবাবু অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং যোগেন-মহারাজের আদেশে বরাহনগর মঠে সংবাদ পাঠাইলেন। তার পাইয়া নানাস্থান হইতে নরেন্দ্রনাথ, স্বামী শিবানন্দ, কালীবেদান্তী ও নিরঞ্জনমহারাজ প্রভৃতি তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও যোগেন-মহারাজের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথের তীর্থ যাত্রা—১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মের শেষ বা বর্ষার প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ তীর্থ পর্যটনে যাইলেন। গঙ্গাধরমহারাজ সেবা করিবার জন্য আগ্রহ করিয়া সঙ্গে চলিলেন। হরমোহন মিত্র ও উপেন মুখুজ্জে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিয়া আসিলেন। রবিবার সকালের ট্রেনে উভয়ে পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। দেওঘরে তাঁহারা দুই একদিন ছিলেন। তথায় সুবিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ও নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অতি সরল ও উচ্চমনের লোক ছিলেন।

প্রয়াগে নরেন্দ্রনাথ—প্রয়াগে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথের সহিত শিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানমার্গের নানা প্রসঙ্গ ও উচ্চাবস্থার কথাবার্তা নরেন্দ্রনাথের নিকট শুনিয়া শিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "স্বামীজী করলে কি? আমার দশ বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড করলে।"

অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র বসু পূর্বে থিওসফিষ্টদের সঙ্গে মিশিতেন ও তৎভাবে সাধন ভজন করিতেন। সেইজন্য নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতে আসিয়া থিওসফির বিষয় নানা প্রকার ব্যাখ্যা ও চর্চা করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্র বসুর কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার দশ বৎসরের ভাব পণ্ড হলো বা না হলো তাতে আমার কি ?"

নরেন্দ্রনাথ ও সিন্ধুক-সা—ডাক্তার গোবিন্দ বসু নরেন্দ্রনাথকে লইয়া সিন্ধুক-সা নামক জনৈক সাধুকে দেখিতে যান। সিন্ধুক-সা ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঁধের উপর থাকিতেন। ত্রিবেণী ও প্রয়াগে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ইহার বিষয় পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

নরেন্দ্রনাথ ও মাধবদাস বাবা—একদিন এক বাঙ্গালী সাধু বৈরাগী নাম মাধবদাসবাবা (যিনি চিট্‌গঞ্জে এক বাড়ির গণ্ডীর মধ্যে ৪০ বৎসর ছিলেন) নরেন্দ্রনাথ ও তদীয় গুরু ভাইদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন—বাঙ্-নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। বৈরাগী মহাশয় অতীব হর্ষিত হইয়া গোবিন্দ ডাক্তারকে বলিলেন, "গোবিন্দ তুমি কি সৎসঙ্গই না করছ !"

নরেন্দ্রনাথ, তদীয় গুরুভাই ও গোবিন্দ ডাক্তার ঝুসি দর্শন করিতে দয়ারামের আশ্রমে যান। তথায় নানারূপ সৎপ্রসঙ্গে ও মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপক কৌতুক রহস্যে দিনটা অতিবাহিত করিয়া সকলে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দ ডাক্তার—একদিন অপরাহ্নে নরেন্দ্রনাথ ও অপর সকলে একত্রিত হইয়া ভজন ও সঙ্গীত করিতেছিলেন। ভাব জমিয়া গেল। সঙ্গীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। গোবিন্দ ডাক্তারের মনে বিশেষ ভক্তি আনন্দ উদ্দীপিত হইল এবং মধুর সঙ্গীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

তখন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি গানে বিশেষ আবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দ ডাক্তারের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আত্মভাব সম্বরণ করিয়া গোবিন্দ ডাক্তারকে উপহাস ও ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, "তোর ত বড় পান্‌সে চোখ।"

প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দ ডাক্তার একদিন নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৎস্য ও মাংস আহার করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত বা অনুচিত?" কারণ গোবিন্দ ডাক্তার নিরামিষভোজী; মৎস্য, মাংস কখনও গ্রহণ করেন নাই এবং অপরের পক্ষে ইহা অপ্রয়োজনীয় ও ধর্মপথের অন্তরায়, তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল। নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন শুনিয়া সহাস্যবদনে স্নেহপূর্ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "দেখ গোবিন্দ, সিংহ, ব্যাঘ্র মাংসাশী এবং চটক পক্ষী (চড়াই) ইহারা তণ্ডুলকণা ও কাঁকর খাইয়া জীবন ধারণ করে কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদির বৎসরান্তে সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি (self procreation) একবার হইয়া থাকে এবং চটক প্রভৃতি নিরামিষভোজীরা সততই সন্তান উৎপাদনে ব্যগ্র। মাংসাহার ধর্মপথের কোন অন্তরায় নহে।"

নরেন্দ্রনাথ ও গুরুজী অমূল্য—একদিন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরুভায়েরা গোবিন্দ ডাক্তারের গৃহে আহার করিতেছিলেন। তথায় গুরুজী অমূল্যর সাথে নরেন্দ্রনাথের শুকনা লঙ্কা খাওয়ার রহস্য হইয়াছিল, সে বিষয় পূর্বে কথিত হইয়াছে। আহারান্তে নরেন্দ্রনাথ ডাক্তার গোবিন্দবাবুকে একান্তে বলিলেন, "অমূল্য যদি মঠে যায় তাহলে তুমি তাহাকে বরাহনগর মঠে পাঠাইয়া দিও।"

নরেন্দ্রনাথের প্রয়াগ পরিত্যাগ—একদিন নরেন্দ্রনাথ গোবিন্দ ডাক্তারকে বলিলেন, "আমরা আজ রওনা হব।" গোবিন্দ ডাক্তার কাতর হইয়া নরেন্দ্রনাথকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন যে নরেন্দ্রনাথ যেন অন্ততঃ আর একটা দিন থাকিয়া যান। কারণ তাঁহাদের সঙ্গ বিচ্যুত হইতে গোবিন্দ ডাক্তারের প্রাণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

নরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে গোবিন্দ ডাক্তারকে বলিলেন, "ইহাতে সত্যের অপলাপ হইবে, আমি আজকেই যাইব।" তাঁহারা সেই দিনই তথা হইতে গাজীপুরে রওনা হইলেন। ঝুসিতে নরেন্দ্রনাথ ও শিবানন্দ স্বামী কিছুদিন ছিলেন।

গাজীপুরে নরেন্দ্রনাথ—নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে কয়বার গিয়াছিলেন তাহা বর্তমান লেখকের স্মরণ নাই। সম্ভবতঃ দুই বা তিনবার। নরেন্দ্রনাথ গাজীপুরে পওহারী বাবাকে দর্শন করিতে যাইলেন এবং পরে শিবানন্দ স্বামী ও বাবুরাম মহারাজ গিয়াছিলেন। গাজীপুরে তখন মুন্সেফ শিরিশচন্দ্র বসুর বাড়িতে বা গগনচন্দ্র রায়ের বাড়িতে অনেকেই গিয়া থাকিতেন। গাজীপুর হইতে নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন পরে গোবিন্দ ডাক্তারকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দ ডাক্তারের প্লেগের সময় গৃহ পরিত্যাগ করিবার কালে সেই পত্রখানি নষ্ট হইয়া যায়। তাহার মর্ম ছিল, "গোবিন্দ আমি গাজীপুরে পৌছিয়াছি ও পওহারী বাবার সাথে দেখা করিতে যাইব। আশা করি তাঁহার কাছ হইতে কিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন পাইব" ইত্যাদি।

গাজীপুরে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথের অমৃতলাল বসু, ডিষ্ট্রিক্ট জজ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাথে দেখা ও নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল। পওহারী বাবার সাথেও তাঁহার দেখা হইয়াছিল এ সকল বিষয় পূর্বে কথিত হইয়াছে।

৺কাশীধামে নরেন্দ্রনাথ—কাশীধামেও নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন ছিলেন। সে বিষয় পূর্বে কথিত হইয়াছে। তখন তাঁহার ঘোর বৈরাগ্য। নরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষত্ব ছিল যে তিনি মাধুকরীই করুন বা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে পথে পথে ঘুরেই বেড়ান একটু সুবিধা বা সময় পাইলেই পুস্তক খুলিয়া পড়িতেন। পড়াশুনা নরেন্দ্রনাথের বংশে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় একটি স্বাভাবিক জিনিস।

স্বামী সারদানন্দ কথিত নরেন্দ্রনাথের তামাক খাওয়া—নরেন্দ্রনাথ, শরৎমহারাজ ও আরও দু'একজন একত্রে যাইতেছেন। নরেন্দ্রনাথ

অতিশয় তামাকপ্রিয় ছিলেন এবং বহুবার খাইতেন। পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া তামাক খাইতে অসুবিধা হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ চটিয়া যাইলেন। একদিন একস্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। শরৎমহারাজ নরেন্দ্রনাথের জন্য একটু দা-কাটা তামাক কল্কে সঙ্গে রাখিতেন। নরেন্দ্রনাথের তামাক খাওয়ার অসুবিধা হওয়ার জন্য ক্রোধে তামাক ও কোল্কে টানিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—কোল্কেটা ভাঙ্গিয়া গেল। মহাবৈরাগ্য, তামাক আর খাইবেন না। শরৎমহারাজের একশিরা ফুলিয়াছিল। এই জন্য তিনি সেই স্থানটিতে দোক্তাপাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎমহারাজ দোক্তাপাতাগুলি টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সকলেই রাত্রিতে শুইয়া রহিলেন। খানিক রাত্রে নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া বালকের মতন আব্দার ধরিলেন, "শরৎ তামাক খাওয়া, শরৎ তামাক খাওয়া।" শরৎমহারাজও বলিতে লাগিলেন, "এখন তামাক কোথায় পাব? তুমি বললে, তামাক আর খাবে না, টেনে সে সব ত ফেলে দিয়েছ, তাতে কোল্কেও ভেঙ্গে গেছে।" নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দুঃ শ্যালা, আরে তখন বলেছিলাম এখন কি তার? আরে খোঁজনা সে সবগুলো কোথায় পড়ে আছে।" শরৎমহারাজ তখন হাসিতে হাসিতে অন্ধকারে চারিদিকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সেই ভাঙ্গা কোল্কেটা পাইলেন। শরৎমহারাজ তখন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "এই নাও তোমার ভাঙ্গা কোল্কেটা পেয়েছি, তামাক আর কোথায় পাবে?" নরেন্দ্রনাথ তখন বলিলেন, "আরে তোর সেই পায়ের বাঁধা দোক্তাপাতা কোথায় খুঁজে দেখ না।" অবশেষে দোক্তাগুলি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পেয়ে হাতে রোগড়ে কোল্কেতে ভরে দেশলাই জ্বেলে একটু আগুন করে দু'জনে হাতে করে সেই ভাঙ্গা কোল্কেতে টান মারতে লাগলেন—আর মহা আনন্দ, যেন দিগ্বিজয় করেছেন। মনের আনন্দে দু'জনায় তামাক খাইয়া পাশাপাশি শুইয়া রহিলেন। একই বলে সরল ভাবের ভালবাসা।

নরেন্দ্রনাথ এত তামাকপ্রিয় ছিলেন যে চূর্ণ দোক্তা দিয়ে হাতে

ঘসিয়া খৈনি করিয়া ঠোঁটের ভিতর রাখিতেন। যখন তামাক খাইবার সুবিধা হইত না তখন তিনি চাষাদের নিকট হইতে খৈনি চাহিয়া লইয়া ঠোঁটে রাখিয়া দিতেন। নরেন্দ্রনাথের বংশে তামাক খাওয়াটা অত্যন্ত প্রবল। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে সর্বদা নস্য লইতেন এবং উড্‌পেন্সিল দিয়া নস্য নাকে ঠাসিয়া দিতেন। রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় কফ্ ফেলিলে মশারির গায়ে নস্যশুদ্ধ কফ্ লাগিয়া যাইত সেইজন্য নরেন্দ্রনাথের ছোট ভাইবোনেরা তাঁহার পার্শ্বে শুইতে চাহিত না। নরেন্দ্রনাথ ঘুমন্ত অবস্থায় রাত্রে উঠিয়া নাকে নস্য দিয়া আবার তবে শুইতেন।

একবার নরেন্দ্রনাথ ও শরৎমহারাজ দুইজনায় হাঁটিয়া কোথায় যাইতেছেন। রাত্রে একটা গ্রামে আশ্রয় লইলেন। গ্রামে কিছু আহার পাইবার পর শুনিলেন যে সেই গ্রামে বড় কলেরা হইতেছে। ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথের মনটা বড় উদ্বিগ্ন হইল। তিনি সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া দূরে একটা শিব মন্দিরে গিয়া শুইয়া রহিলেন—মনে করিলেন যে সেখানে কোন কলেরা রোগী নাই। কিন্তু প্রাতে উঠিয়া দেখেন যে তিনি যেখানে শুইয়াছিলেন ঠিক তাঁহারই পার্শ্বে এক কলেরা রোগী শুইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ তখন একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "যে জিনিসকে ভয় করি সেই জিনিসই পেছনে চলে"

নরেন্দ্রনাথ ও দেশাই—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অবস্থান কালে গুজরাট দেশীয় দেশাই নামক জনৈক ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট আসিতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী দেশাইকে বলিলেন, "দ্যাখ, সাধুর জীবন ভারতবর্ষে অতি কষ্টকর। ভিক্ষা করে খাওয়া আর স্যাঁৎস্যাঁতে মেঝেতে পড়ে থাকা, সেইজন্য লাম্বাগো বা গেঁটে বাত হয়ে যায়। ৺কাশীতে যখন ছিলুম, মাধুকরী করতুম আর একটা ভূতের বাগানে পড়ে থাকতুম। সেই পোড়ো বাগানে স্যাঁৎস্যাঁতে জায়গায় শুয়ে থেকে গেঁটে বাত ধরে গেল। দেখলুম বাগানটাতে গাছে খুব লেবু ফলে রয়েছে। সেই লেবু পাড়তুম আর চুষতুম তাইতে অসুখটা অনেক কমে

গিয়েছিল।" এই বলিয়া দেশাইকে সাধুর জীবনে যে কি কষ্ট করিতে হয় তাহাই আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন। স্বামীজীর লণ্ডনে অবস্থানকালেও মাঝে মাঝে এই রোগটা দেখা দিত।

আলমোড়ায় নরেন্দ্রনাথ—একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্ঘ আলমোড়ায় বদ্রিসার বাড়িতে উপস্থিত হইলেন এবং কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। আলমোড়ায় অবস্থান কালে নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগ্নী আত্মহত্যা করে এবং বর্তমান লেখক সেই খবর শরৎমহারাজের নামে তারযোগে নরেন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করেন। শরৎমহারাজ টেলিগ্রামখানি নরেন্দ্রনাথকে শুনাইলে, তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হন; ইহাতে তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। তিনি তখন শরৎমহারাজ প্রভৃতিকে কঠোরভাবে কহিয়াছিলেন যে তাহাদের স্থিতি-গতির বিষয় বাঙ্গালাদেশে কেহ যেন খবর না দেয়। নরেন্দ্রনাথ সকলকে ত্যাগ করিয়া একাকী পর্যটন করিবেন, কারণ পাঁচজনে একসঙ্গে থাকিলেই বাহির হইতে অনেক খবরাখবর হইয়া থাকে।

আলমোড়ায় অবস্থানকালে একবার একটি বড় মাছ সকলে পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মহাশের মাছ। মাছের পেট হইতে খানিকটা ডিম বাহির হইয়াছিল। বাঙ্গালী, সেইজন্য মাছের ডিম পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়া রাঁধিয়া খাইলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথের দাস্ত হইতে লাগিল এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন পরিচিত পাহাড়িরা আসিয়া পীড়ার নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে বুঝিতে পারিল যে মাছের ডিম খাইয়াছে, সেইজন্য দাস্ত হইতেছিল। তখন তাহারা বুঝাইয়া দিল যে পাহাড়ে মাছের ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ এবং যতক্ষণ না ডিমের শেষ টুকরা পর্যন্ত বাহির হইয়া যায় ততক্ষণ দাস্ত চলিবে। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইলেন। ইংলণ্ডের লোকেরা মাছের ডিম (fishroe) খায় না, বোধ হয় উহাদেরও এইরূপ কোন কারণ আছে সেইজন্য তাহারাও খায় না।

গাড়োয়াল পাহাড়ে নরেন্দ্রনাথ--নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া একবার গাড়োয়াল পাহাড়ের কোন এক স্থানে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় একটি গ্রাম দেখিতে পাইলেন। চার পাঁচ জন মিলিয়া গ্রামে গিয়া বসিলেন কিন্তু গ্রামস্থ কোন লোকই খবরাখবর লইল না। এক সময় এক সাধু গঙ্গাধরমহারাজকে বলিয়াছিলেন যে গাড়োয়ালদের গ্রামে গিয়া খুব চিৎকার না করিলে কেহ কিছু দিবে না। বালকস্বভাব গঙ্গাধরমহারাজ গল্পটি শুনিয়াছিলেন মাত্র কিন্তু কার্যে পরিণত করেন নাই। অবশেষে সাধুর উক্তিটি কার্যে পরিণত করিবার জন্য সকলে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গ্রামের মধ্যে একস্থলে বসিয়া কতকটা কৌতুক ও কতকটা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তারস্বরে সকলে মিলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন, "লেকড়ি লাও, আটা লাও, ডাল লাও" এইরূপ গগনভেদী চীৎকার করায় এক পাহাড়ি বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিল এবং গাঁয়ের মোড়লকে ডাকিতে লাগিল, "এ পার্‌ধান, বাবা লোক আয়া হ্যায়" পাহাড়িয়া মোড়ল বা প্রধানকে পার্‌ধান বলিয়া থাকে। এই কথাটি তাহাদের সম্মান সূচক শব্দ। পার্‌ধান আসিয়া কাঠ, ডাল, আটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত সামগ্রী দিল। পাহাড়ে একটি কথা প্রচলিত আছে যে—"গাড়োয়াল সরীখা দাতা নহী, বেগর লট্টা দেতা নহী।" অর্থাৎ জোর করিয়া লইতে পারিলে, গাড়োয়াল-বাসীদের তুল্য দাতা নাই।

নরেন্দ্রনাথ ও অখণ্ডানন্দ স্বামী—গঙ্গাধরমহারাজ নরেন্দ্রনাথকে গ্রামে বা পল্লীতে মাধুকরী করিতে যাইতে দিতেন না। তিনি নিজে বাহির হইয়া নরেন্দ্রনাথ ও নিজের জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। শরৎমহারাজ নিজের জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিতেন। কালীবেদান্তী উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ে পর্যটন করিতে করিতে একবার এক গ্রামে ভিক্ষা করিতে যান। ভেড়াওয়ালাদের একটা বড় কুকুর তাঁহাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল। কালীবেদান্তী নিরুপায় হইয়া গ্রামের লোকদিগকে ডাকাডাকি করাতে তবে তাহারা কুকুরটিকে ফিরাইয়া লইয়া যায়।

এইজন্য সকলে ঠাট্টা করিত, "ভিক্ষাবাজে আসি কুত্তা বোলাই লে রাম।"

কাশীবেদান্তী অতি প্রত্যুষে বা সন্ধ্যার সময় ভিক্ষা করিতে যাইতেন কারণ গ্রামের পুরুষেরা সকাল হইলেই আপন আপন কার্যে চলিয়া যায় ও সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়া আসে।

স্বামী সচ্চিদানন্দের ভ্রমণ—দীনমহারাজ এক সময় পাহাড় পর্যটন করিতে করিতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া নৈনিতাল জেলায় পৌছিলেন। তথায় দেখিলেন যে দূরে একখানি গ্রাম এবং তাহাতে অনেকগুলি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শিবালয় রহিয়াছে। একটি শিবালয়ে একজন সাধু বসিয়া আছেন। দীনমহারাজ অপর একটি মন্দিরে বসিয়া বিশ্রাম করিবার অল্পক্ষণ পরেই এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া অতি বিনীতভাবে দীনমহারাজের কি কি প্রয়োজন জানিতে ইচ্ছা করিলেন। দীনমহারাজ তখন ক্ষুধার্ত—কিছু খাদ্যদ্রব্য চাহিলেন,—"কুছ ভোজন মিল্ যায়?" স্ত্রীলোকটি ত্বরান্বিত হইয়া দীনমহারাজকে আহার্য আনিয়া দিলেন এবং আহারান্তে পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে তিনি যদি ইচ্ছা করেন রেল ভাড়া, কম্বল বা অন্য কোন জিনিস লইতে পারেন। দীন-মহারাজ ত্যাগী পুরুষ, তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। দূরের অপর সাধুটি সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবেন বলিয়া আর একটি স্ত্রীলোকের কাছ হইতে অনেক টাকা গ্রহণ করিলেন। অপর স্ত্রীলোকটি স্বচ্ছন্দে সেই সাধুটির পাথেয় দিলেন। দীনমহারাজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে অপর গ্রামের লোকেরা বলিল যে পূর্বের গ্রামখানি রমজানিদেব গ্রাম ছিল অর্থাৎ পাহাড়ে নট ও নটী বলিয়া এক জাতি আছে তাহাদেরই ঐ গ্রাম ছিল। দীনমহারাজ কিছুই জানিতেন না, সেইজন্য কোন বিশেষ কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

হৃষিকেশে নরেন্দ্রনাথ—নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে পাহাড়ের অনেক স্থান একত্রে ভ্রমণ করিয়া সকলেই কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে সকলের যেন ভগবান লাভের জন্য একটা

উন্মত্তভাব আসিয়াছিল। জগত-সংসার আছে কি নাই তাহার কোন খোঁজ খবর থাকিত না। দেহটাকে তুচ্ছ মনে করিতেন, অনবরত মুখে শাস্ত্রালাপ ও কঠোর সাধনার কথা লাগিয়া থাকিত। অবশেষে সকলে হৃষিকেশে গমন করিলেন। হৃষিকেশ তখন মহা দুর্গম স্থান। রাস্তা ঘাট কিছুই তখন ছিল না, দুই একটি সত্র, দুই একটি মন্দির ব্যতীত সমস্তই জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জঙ্গলে বুনো হাতী ও বাঘের বিশেষ ভয় ছিল। সকলেই প্রায় ঝুপড়ি বাঁধিয়া ইচ্ছামত স্থানে বাস করিতেন। সান্নাল মহাশয় তখন সঙ্গে ছিলেন। রাখালমহারাজ এবং হরিমহারাজও সঙ্গে ছিলেন। কারণ পাঁচ ছয়জনে একত্রিত হইয়া হৃষিকেশে বাস করিয়া ছিলেন। কঠোর তপস্যা করিয়া যেটুকু সময় থাকিত তাহা শাস্ত্রালাপে ও ভগবৎ প্রসঙ্গে অতিবাহিত হইত। নরেন্দ্রনাথ এই সময় কেদারখণ্ড পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়া ছিলেন। সঙ্ঘের ভিতর একবার এক জনের অসুখ করিলে, তখন সকলেই স্থির হইয়া তাঁহার সেবা করেন। তাঁহাদের অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা দেখিয়া হিন্দুস্থানী সাধুরা আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "এই বাঙ্গালী সাধুদের পরস্পরের প্রতি কি শ্রদ্ধা, কি ভালবাসা। অপর সাধুদের ভিতর এরূপ দেখা যায় না।" এই জন্য হিন্দুস্থানী সাধুরা এই সঙ্ঘকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

হৃষিকেশে নরেন্দ্রনাথের খিচুরি খাওয়া—হৃষিকেশে অবস্থানকালে অতি কঠোর তপস্যা করায় ও নিরন্তর অল্প আহার ও অনাহারে থাকায় নরেন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। কয়েক দিবস জ্বর হইল। জ্বর একটু কমিলে নরেন্দ্রনাথ খিচুড়ি খাইতে ইচ্ছা করিলেন। সকলে মিলিয়া সত্র বা অন্যান্য স্থান হইতে চাল ডাল প্রভৃতি যোগাড় করিয়া আনিয়া খিচুড়ি রাঁধিতে চেষ্টা করিলেন। অতি ধীর ও বালকস্বভাব রাখালমহারাজ খিচুড়ি সুস্বাদু হইবে, এই ভাবিয়া এক ডেলা মিছরি ফেলিয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ লঙ্কা খাইতে ভালবাসিতেন এবং তীব্র ঝালবস্তু তাঁহার প্রিয় ছিল। মিষ্ট দ্রব্য একেবারেই পছন্দ করিতেন না। প্রথম দিন পথ্যের সময় খিচুড়ি মুখে দিয়াই একেবারে মুখ সিটকাইয়া

উঠিলেন, তাহার পর খিচুড়ির ভিতর লম্বা একটা সুতা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "খিচুড়িতে একটা সুতা কেন রে, আর খিচুড়িটা এত মিষ্টি হয়েছে কেন?" সকলে বলিল "রাখালমহারাজ খিচুড়িতে এক ডেলা মিছরী ফেলে দিয়েছে।" নরেন্দ্রনাথ তখন বিরক্ত ও কৌতুকচ্ছলে রাখালমহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "দুঃ শালা! খিচুড়িতে কখন মিছরী দেয় রে? শ্যালা তোর একটু আক্কেল নেই?" রাখালমহারাজ অতি ধীর ও নম্র স্বভাব, কাচুমাচু করিয়া একেবারে নীরব রহিলেন—যেন কত অপরাধ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পর বলরামবাবুর বাড়িতে একবার কে একজন খিচুড়ি রাঁধিতেছিল; রাখালমহারাজ বড় ঘরটির পশ্চিমদিকের তাক হইতে এক ডেলা মিছরী খিচুড়িতে দিয়া আসিলেন। সান্ন্যাল মহাশয় তাই কৌতুক করিয়া রাখালমহারাজকে বলিলেন, "একি হৃষিকেশের খিচুড়ি রান্না হচ্ছে নাকি?" বর্তমান লেখক ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় সান্ন্যাল মহাশয় তখন এই উপাখ্যানটি বলিয়াছিলেন।

পূর্বে হৃষিকেশ, কনখল প্রভৃতির অবস্থা—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও তৎপূর্বে হরিদ্বার, কনখল, হৃষিকেশ প্রভৃতি স্থান অতি দুর্গম ছিল। তখন সাহারাণপুর পর্যন্ত রেল হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পর হরিদ্বার নামে একটি ষ্টেশন হইল। রাস্তা, ঘাট, পুল বাড়ি তখন এসব কিছুই ছিল না। লাক্‌সারেও একটি ভাঙ্গা মালগাড়িতে ষ্টেশন হইল। ভীষণ বন, তখন অতি অল্প লোকের বাস ছিল। বুনো হাতি ও বাঘের ভয়ে সর্বদা লোককে শঙ্কিত থাকিতে হইত। সত্যনারায়ণের মন্দির, গঙ্গা ও সঙ নদীর মাঝের একটা চড়াতে ছিল এবং সেখানে চার পাঁচ ঘর বসতিও ছিল। সে চড়াটি এখন মন্দির সমেত ভাসিয়া গিয়াছে। হৃষিকেশে কালী কম্বলিবাবার সত্র এবং আর একটি কি দুটি সত্র ছিল। দুটি সত্র সময় সময় বন্ধ থাকিত, শুধু কম্বলিবাবার সত্রই বারোমাস খোলা থাকিত। আগেকার পথ মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া যাইতে হইত। এক্ষণে সেই স্থানকে ত্রিবেণীর ঘাট বলে। তখন বাজার হাট

কিছুই ছিল না, দুই একখানি মুদির দোকান ও লাড্ডুর দোকান ছিল। পথ দুর্গম বলিয়া যাত্রী বড় যাইত না। সাধুরাই কেবল বাস করিতেন ও কম্বলিবাবার সত্র হইতে আহারাদি পাইতেন। তখন সত্রে সাধুর আবশ্যকীয় সমস্ত বস্তু চাহিলেই দিত এবং অভ্যাগত সাধুদিগকে অ ত যত্ন ও শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে ভোজন করাইত। কম্বলিবাবার উদ্যমী ও মহাত্যাগী সাধু ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে হৃষীকেশ হইতে উত্তরাখণ্ডে বদরিনারায়ণের পথে অনেক সদাব্রত, সত্র, রাস্তা, পোল ইত্যাদি স্থাপিত হয়। তিনি যেমনি ত্যাগী তেমনি কর্মবীর ছিলেন।

কম্বলীবাবার সত্র—নরেন্দ্রনাথ হৃষীকেশে অবস্থানকালে কম্বলী-বাবার উভয়বিধ ভাব বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং আমেরিকা হইতে ফিরিয়া অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কম্বলিবাবার অনেক উল্লেখ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের কর্মের ভাব কম্বলিবাবার কার্য দেখিয়া অনেক পরিমাণে জাগ্রত হইয়াছিল। ইহা অনেকটা বেশ অনুমান করিতে পারা যায়। হৃষীকেশে তাঁর পীড়ার সময় ঔষধ ও চিকিৎসার বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল এবং সাধুদিগের শরীর অসুস্থ হইলে কিরূপ দুর্গতি হয় এই সকল বিষয় তিনি পরিদর্শন ও হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া সেবাশ্রম করিবার জন্য এত প্রয়াস করিয়াছেন।

রাখালমহারাজ বৃন্দাবনে ও কুসুম সরোবর প্রভৃতি স্থানে যে রকম তপস্যা করিয়াছিলেন হৃষিকেশ অবস্থানকালে তিনি একমনা হইয়া ততোধিক সাধন করিয়াছিলেন। সারাদিন বসিয়া একনিষ্ঠ মনে জপ করিতেন। অল্পভাষী, ধীর, নম্র ও ঋজু স্বভাব বলিয়া তিনি কোন গোলমালে যাইতেন না। ইহা বলা বাহুল্য মাত্র যে এরূপ কঠোর তপস্যা না করিলে ভবিষ্যতে এরূপ উচ্চাবস্থার সাধক হইতেন না।

সারদানন্দস্বামীর নরেন্দ্রনাথের কাপড় কাচা—নরেন্দ্রনাথের শরীর বড় অসুস্থ, চলা ফেরা করিবার সামর্থ বড় ছিল না, প্রায়ই শুইয়া থাকিতেন। নরেন্দ্রনাথের পূর্বদিনের পরিধেয় কাপড়খানি কাচিতে হইবে, সেইজন্য শরৎমহারাজ আগ্রহ করিয়া নিজে কাপড়খানি

কাচিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ অনিচ্ছুক ও ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সে কি হয়, তুমি সাধু; তুমি আমার কাপড় কাচিবে কেন?" তথাপি শরৎমহারাজ আগ্রহান্বিত হইয়া কাপড়খানি লইয়া কাচিয়া দিলেন। কার্যটা সামান্য হইলেও পরস্পরের প্রতি কি একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের রূপান্তর দেখিতেন এবং সেই-ভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। হাসি কৌতুক ও বিদ্রূপের ভিতরও একটা মাধুর্যভাব ছিল এবং পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এক প্রাণ ও ভালবাসা খুব প্রবল ছিল।

নরেন্দ্রনাথের আঁটপুরে গমন ও অখণ্ডানন্দ স্বামীকে লইয়া কৌতুক রহস্য করা—গঙ্গাধরমহারাজ বয়সে সর্বকনিষ্ঠ, এবং হাস্য কৌতুক প্রিয় ও বালকোচিত চপলস্বভাব ছিলেন সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ, গিরিশবাবু প্রভৃতি তাঁহাকে লইয়া বিশেষ হাস্য কৌতুক করিতেন। বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে শীতের সময়ে একবার নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অনেকে আঁটপুরে বাবুরামমহারাজের বাড়িতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সকলের খেয়াল উঠিল—ধুনি জ্বালিয়া রাত্রিতে বসিয়া বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন বড়দিন বা যীশুর আবির্ভাবের দিন ছিল। যদিও সকলে বাইবেল ও যীশুর উপাখ্যান লইয়া মাতোয়ারা হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি নরেন্দ্রনাথের ও গঙ্গাধরমহাজের কৌতুক-প্রিয় এবং চাপল্যভাব গাম্ভীর্যের ভিতরেও প্রকাশ পাইতেছিল। কথা-প্রসঙ্গে সারভানটিস্ রচিত ডন কুইক্সট গ্রন্থের উল্লেখ হইল। ডন কুইক্সটের এক ভৃত্য ছিল, তাহার নাম সাঙ্কাপাঞ্জা। সাঙ্কাপাঞ্জা এক পান্থশালায় আহারের মূল্য না দেওয়ায় পান্থশালার সকলে সাঙ্কা-পাঞ্জাকে একখানি কম্বলে শোয়াইয়া কম্বলের চারটি খুঁট ধরিয়া লুফিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিও গঙ্গাধরমহারাজকে এক কম্বলে ফেলিয়া কম্বলের চারি খুঁট ধরিয়া তদ্রূপ লুফিতে লাগিলেন। কৌতুকপ্রিয় গঙ্গাধরমহারাজও সাঙ্কাপাঞ্জার মত হস্তপদাদি প্রসারণ ও মুখভঙ্গি

করিয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন এবং তাহা দেখিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ইহাই অকপট ভালবাসার লক্ষণ—চাপল্যের ভিতরেও সেই প্রগাঢ় ভালবাসা।

সকলের উত্তরাখণ্ডে বাসকালে সান্যাল মহাশয় বদরিনারায়ণ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। গঙ্গাধরমহারাজ বরাহনগর মঠ হইতে যখন পাহাড়ে চলিয়া যান তখন কিছুদিন তাঁহার কোন খবর ছিল না। সকলেই তাঁহার শরীর আছে বা নাই সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি সেইবার প্রথম তিব্বত যাত্রা করিয়াছিলেন তথায় অল্পদিন থাকিয়া আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং শিবানন্দ মহারাজ তাঁহাকে তিব্বতীয় পরিচ্ছদে বদ্রিনারায়ণে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মঠে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করায় তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনরায় তিব্বতে যাত্রা করেন।

মিরাটে নরেন্দ্রনাথ—হৃষিকেশে শারীরিক বিশেষ আরোগ্যলাভ না, হওয়ায় সকলেই অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন এবং অবশেষে সকলে মিরাটে আসিয়া পৌঁছিলেন। মিরাটে সকলের একত্রে আহার করার অসুবিধা হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আহার করিয়া একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। স্থান পরিবর্তন ও ঔষধ পথ্য পাওয়ায় যাঁহারা রুগ্ন হইয়াছিলেন তাঁহারা একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অখণ্ডানন্দ স্বামী ও মিরাটের লাইব্রেরীয়ান—মিরাটের উকিল কালীপদ বসু মহাশয়ের উদ্যোগে ডিউক্ অফ্ কনটকে দিয়া মিরাটে একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। পুস্তকাগারটি অতি সুন্দর ও তথায় বহু পুস্তক আছে। এই পুস্তকাগার হইতে গঙ্গাধরমহারাজ নরেন্দ্রনাথের অধ্যয়ন করিবার জন্য পুস্তক আনিয়া দিতেন। মোটা মোটা বড় বড় বই আনিতেন আর সেই সব বই নরেন্দ্রনাথের দুই একদিনের ভিতর পড়া হইয়া যাইলে তাহা ফেরৎ দিয়া আবার নূতন বই আনিয়া দিতেন। এইরূপে কিছুদিন চলিতে লাগিল। শেষে একদিন ঠাট্টা করিয়া লাইব্রেরীয়ান গঙ্গাধরমহারাজকে বলিলেন, "কি মশাই, আপনি

.যে বই নিয়ে যান সেই বইয়ের রংচঙে বাঁধাই দেখতে না পড়তে ?" গঙ্গাধরমহারাজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, স্বামীজীর জন্যে বই নিয়ে যান, তিনি বইগুলি দু'এক দিনের মধ্যেই সব পড়ে ফেলেন। তাহা শুনিয়া লাইব্রেরীয়ান বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তাত বটেই! বুঝেছি!" গঙ্গাধরমহারাজ লাইব্রেরীয়ানের বিদ্রূপ শুনিয়া মনঃক্ষুন্ন হইলেন কারণ তিনি নরেন্দ্রনাথকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। এইরূপ ব্যাঙ্গোক্তি তাঁহার পক্ষে অতি কষ্টদায়ক হইল। গঙ্গাধরমহারাজ ফিরিয়া নরেন্দ্রনাথকে সমস্ত বিষয় বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ সমস্ত শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্ লোকটাকে ডেকে নিয়ে আসিস্ কি করে পড়তে হয় দেখিয়ে দেবো। দ্যাখ্, কেউ বা এক একটা কথা দেখে দেখে পড়ে, কেউ বা এক একটা sentence (বাক্য) দেখে দেখে পড়ে, আর আমি পড়ি কি রকম জানিস ? প্যারাগ্রাফ্ দেখে পড়ি এই বলিয়া তিনি গঙ্গাধরমহারাজকে বলিলেন, "তুই বইটা ধর না আমি সব বলে যাচ্ছি।" গঙ্গাধরমহারাজ বইটি ধরিলে নরেন্দ্রনাথ বইয়েতে যাহা লেখা ছিল তাহা হইতে স্থানে স্থানে সেই ভাষাতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া গঙ্গাধরমহারাজ ও উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। একগ্রতা থাকিলে ও ভাবের সহিত তন্ময় হইলে মানুষের এইরূপ হইয়া থাকে। পুস্তক পাঠ ও ধ্যান এক করিতে পারিলে পুস্তকস্থিত ভাবগুলি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

নরেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চা—বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের বিদ্যা-চর্চায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাঠ্যাবস্থা হইতেই তিনি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। বি, এ, পরীক্ষার সময় তাঁহার পঠিত কোরিও-লেনাস, মিল্টন, বাইরন, হ্যামিলটন প্রভৃতি পুস্তকগুলি মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরাজী কাব্যের ভিতর মিল্টন নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল এবং তিনি তাহা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। মিল্টন-আবৃত্তি পদ্ধতি তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। গম্ভীর ও তরঙ্গায়মান

শব্দে তিনি মিল্টনের শ্লোকগুলি অতি সুন্দর ভাবে আবৃত্তি করিতেন; বর্তমান লেখক তাঁহার নিকট হইতে মিল্টনের আবৃত্তি পদ্ধতি শিখিয়াছিলেন। শেক্সপিয়রের গ্রন্থগুলির সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন এবং আমেরিকায় বক্তৃতাকালে "রোমিও জুলিয়েট" ও "মিড সামার নাইটস্ ড্রিম" হইতে উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলেন। বাইরন তিনি খুবই পড়িতেন এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহা ব্যতীত সাধারণ ইংরাজী কাব্য তিনি প্রবীণ অধ্যাপকের ন্যায় পড়াইতে পারিতেন। অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তকই তাঁহার বিশেষ আয়ত্ব ছিল। কলেজে তিনি হ্যামিল্টনের 'মেটাফিজিক্স' পড়িয়াছিলেন। জন ষ্টুয়ার্টমিল ও হার্বার্ট স্পেনসার তিনি অতিশয় পড়িতেন। মিল ও স্পেনসারের প্রভাব প্রথম অবস্থায় তাঁহার জীবনের উপর বিশেষ কার্য করিয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে ইংরাজী পুস্তক অনুবাদ করা—তিনি হার্বার্ট স্পেন্সারের এডুকেশন পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। এই সময় হার্বার্ট স্পেন্সার নিজ হস্তে অনুবাদের অনুমতি প্রদান ও বিশেষ উৎসাহ দিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু সেই পত্রখানি তখন বিশেষ আদরের জিনিস না বিবেচনা করায় যত্ন করিয়া রক্ষা করা হয় নাই সেইজন্য পত্রখানি নষ্ট হইয়া যায়। লকের পুস্তকখানি তিনি খুব পড়িতেন, সম্ভবতঃ সেই পুস্তকখানিও মঠের পুস্তকাগারে প্রদত্ত হইয়াছে। প্লেটোর পুস্তকগুলিও তাঁহার বিশেষ পড়া ছিল। কারণ বর্তমান লেখককে ও কালীবেদান্তীকে তিনি বলরাম বাবুর বাড়িতে প্লেটোর 'ফিডন' পড়াইয়াছিলেন। উবেরওয়েগের 'হিষ্টোরি অভ ফিলসফি', ক্যাণ্ট ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রগুলি তিনি প্রথমেই পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথের ইতিহাস অধ্যয়ন—ইতিহাস অধ্যয়নের বিষয় বিশেষ বলা বাহুল্য। কারণ নরেন্দ্রনাথের পিতা ইতিহাস বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতেন। নরেন্দ্রনাথের বংশে সকলেই ইতিহাসে পারদর্শী।

নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত তারকনাথ দত্ত গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথের গণিত শাস্ত্র চর্চা ইচ্ছাটা তত ছিল না। স্কুলে পড়া যতটুকু গণিত শাস্ত্র জানা আবশ্যক ততটুকু শিখিয়াছিলেন, তাহার বেশী আলোচনা করেন নাই। পলিটিকাল ইকনমি, সোসিয়োলজী তাঁহার প্রিয় জিনিস ছিল। এক সময় তিনি প্যাথলজী, জুলোজী পড়িতে সুরু করিলেন। তিনি ফিরি করা পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে ফরাসী রন্ধনের পুস্তক ও "সোলজার পকেট ড্রিল বুক" খরিদ করিয়া পড়িতে লাগিলেন। যখন এণ্ট্রান্স পাশ করেন তখন নেপোলিয়নের ভাবটি বিশেষ জাগ্রত হইয়াছিল। এইজন্য কয়েকখানি ড্রিল বুক পড়িতে লাগিলেন। আবার অন্য সময় ফিজিওলজী প্রভৃতি নানা শাস্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথের বাঙ্গলা পুস্তক অধ্যয়ন—বাঙ্গালা পুস্তকের ভিতর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' এত মন দিয়া পড়িয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে সেই পুস্তক হইতে স্থান উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেন। হীরেমালিনীর কথা লইয়া মাঝে মাঝে কৌতুক করিতেন এবং মানসিংহের যশোর যাত্রা অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অনেক সময় বলিতেন, "মাইকেলই বাঙ্গালা দেশে একটা বিশেষ কবি জন্মে ছিল।" দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশীর' কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি তামাসার কথা হইলেই তিনি 'সধবার একাদশীর' কোন না কোন বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। 'নীলদর্পন' হইতেও তিনি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন। একথা এখানে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে দীনবন্ধু মিত্র ও ঈশ্বর গুপ্ত নরেন্দ্রনাথদের গৌর মোহন মুখার্জির গলির বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত ও ওঠাবসা করিতেন। নরেন্দ্রনাথের খুল্লপিতামহের সহিত ঈশ্বর গুপ্ত "ভাই" পাতাইয়াছিলেন। এবং নরেন্দ্রনাথের পিতা তাঁহাকে খুল্লতাতের

ন্যায় সম্মান করিতেন। যদিও ঈশ্বর গুপ্তের কথা নরেন্দ্রনাথ সর্বদ বাড়িতে শুনিতেন কিন্তু তাঁহাকে দেখেন নাই। দীনবন্ধু মিত্র পাড় প্রতিবেশী, সেইজন্য শৈশবে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কবিতা 'সুদর্শন সবিতা' কাব্যখানি তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং ঐ ছন্দটি তাঁহার বিশেষ ভাল লাগিত। রামদাস সেনের গ্রন্থগুলি বিশেষতঃ 'ভারত রহস্য' খানি খুব পছন্দ করিতেন।

নরেন্দ্রনাথের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন—কালিদাসের গ্রন্থের ভিতর কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও মেঘদূত তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহাকে এফ. এ, পড়িবার সময় ভট্টি পড়িতে হইয়াছিল। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র ও কাব্যের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। হরমোহন মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আনিয়া দিত আর নরেন্দ্রনাথ সেইগুলি পড়িয়া লইতেন। 'ললিতবিস্তর'খানি তাঁহার বিশেষ জানা ছিল। একবা ন্যায় পড়িবার ইচ্ছা হওয়ায় সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ন্যায় শাস্ত্রগুলি পা করিয়া লইলেন। রাজপুতনায় অবস্থানকালে জৈনদের পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া লইয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডে বাসকালে ফরাসী ভাষা বেশ শিখিয়া লইয়াছিলেন। বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্র তিনি যে জানিতেন সে বলা বাহুল্য। পাঠ্যাবস্থায় তিনি খৃষ্টান ও ইহুদীদিগের অনেক বই পাঠ করিয়া ছিলেন। এসিরিয়ান্‌দিগের বড় বড় নাম উচ্চারণ করিতে শুনিয়া বলরাম বাবু কৌতুক করিয়া বলিতেন, "নরেনবাবু, কি করে তোমরা এই বড় বড় নাম উচ্চারণ কর আর মনে রাখ?"

ফরাসী বিপ্লববাদের বইগুলি তিনি বড় মন দিয়া পড়িয়াছিলেন এক সময় তাঁহার ঐ বইগুলি বড় ভাল লাগিত। কারলাইলের 'হি এণ্ড হিরো ওয়ারসিপ' এবং এমারসনের 'রিপ্রেজেন্টেটিভ ম্যান' এ দুইখানি গ্রন্থ লইয়া তিনি অনেক তর্ক বিতর্ক করিতেন। রামায়ণ মহাভারত বিশেষ প্রিয় ছিল। যে সমস্ত বড় বড় পুস্তকের নাম কর গেল তাহা নরেন্দ্রনাথের বিদ্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। যাঁহাকে সম বিশেষ পুস্তক পড়িতে হইয়াছিল তাঁহার এক গণ্ডুস মাত্র পরিচ

দেওয়ায় বিদ্যাচর্চার বিশেষ কিছু পরিচয় দেওয়া হইল না। কেবল মাত্র এস্থানে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল।

স্বামী তুরিয়ানন্দের মাংস আহার করা—হরিমহারাজের সহিত প্রথম যখন বাগবাজারে চিৎপুর রোডের ডাক্তারখানাটিতে দেখা হয়, তখন হইতেই তাঁহার ভিতর যে একটি বিশেষত্ব আছে তাহা স্পষ্ট বোঝা গিয়াছিল। তখন তাঁহার বয়স অল্প হইলেও সাধারণ লোক হইতে তিনি সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ও বর্তমান লেখক যখন ডাক্তারখানাটিতে যান তখন নরেন্দ্রনাথ চাপল্য ও কৌতুকভাবে পরিত্যাগ করিয়া অতি গম্ভীর ও সংযত ভাবে হরিমহারাজের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। মিরাটে অবস্থানকালে একদিন নরেন্দ্রনাথ হরিমহারাজকে মাংস খাইতে দেন। নরেন্দ্রনাথের স্বহস্তে রন্ধন করা মাংস এবং স্বয়ং তিনি দিতেছেন এইজন্য অনভ্যস্ত হইলেও নির্বিকার হরিমহারাজ আনন্দের সহিত সেই মাংস খাইলেন। এমন নির্লিপ্ত ও নির্বিকার পুরুষ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিমান পুরুষ হইলেও তিনি শক্তিকে সংযত করিয়া অতি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় সাধারণের সম্মুখে থাকিতেন।

নরেন্দ্রনাথ ও আমীর সাহেব—মিরাটে অবস্থানকালে নরেন্দ্রনাথের নাম সর্বত্র প্রচারিত হইল এবং অনেক ভদ্রলোক আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মুসলমান সমাজের ভিতরেও তাঁহার নাম প্রচারিত হইল। মিরাটে কাবুলের রাজ্যচ্যুত বা তৎসম্পর্কীয় এক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি রাজবন্দী হইয়া বাস করিতেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট আমীর সাহেব বলিয়া অভিহিত হইতেন। আমীর সাহেবের কাছে কথা উঠিল যে একজন হিন্দুফকির মিরাটে আসিয়াছেন। তিনি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও সকল ধর্মের প্রতি সমান আস্থা দেখাইয়া থাকেন। মুসলমান স্বভাবতঃই ধর্মপরায়ণ ও ঈশ্বর অনুরাগী। ঈশ্বরের কথা ও ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে সঙ্কুচিত হয় না কিন্তু সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী হইলেই

তাঁহারা বিরক্ত হইয়া যান ও বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। তাঁহাদের শ্রদ্ধা ভক্তি তখন দ্বেষ ও ক্রোধে পরিণত হয়। আমীর সাহেব খবর পাঠাইলেন যে তিনি হিন্দু ফকিরটিকে দর্শন করিতে যাইবেন। নির্দিষ্ট সময়ে মস্‌জিদ বা তীর্থদর্শন করিতে যাইলে যে প্রকারে উজু বা হস্তপদাদি প্রক্ষালন বা অষ্ট অঙ্গে জল দিয়া স্নান করিতে হয় আমীর সাহেব তদ্রূপ ভাবে শুদ্ধ পবিত্র হইয়া লোকজন সঙ্গে লইয়া হিন্দুফকির দর্শন করিতে আসিলেন। গুরুকে যে প্রকার সম্মান করিয়া তাঁহার আজ্ঞা লইয়া তবে বসিতে হয় আমীর সাহেবও সেইরূপ করিলেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত ধর্মবিষয়ে নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিয়া বিশেষ প্রীত হইলেন এবং তিনি যে একজন সিদ্ধ পুরুষ বা আউলিয়া দর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা জন্মাইল এবং সকলকে বলিতে লাগিলেন। আরবী পাশা কলিকাতায় আসিয়া যেরূপ ভাবে কেশবচন্দ্র সেনকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন আমীর সাহেবও নরেন্দ্রনাথকে সেইভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাইলেন।

নরেন্দ্রনাথ মুসলমান ধর্মের বহু গ্রন্থপাঠ করিয়াছিলেন সেইজন্য আমীর সাহেবকে মুসলমান ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ও অন্যান্য ধর্মের সহিত সামঞ্জস্য অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মুখে মুসলমান ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমীর সাহেব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। অতিথিসেবা করা মুসলমান ধর্মের এক প্রধান অঙ্গ, সেইজন্য আমীর সাহেব রাজোচিত এক সিধা নরেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন। সহরের উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী লোক দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং পোলাও রন্ধন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এইদিন হরিমহারাজ নরেন্দ্রনাথের সাথে মাংস খাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই রন্ধন বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের পিতার জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের বাড়িতে মাংস ও পোলাও সর্বদাই হইত এবং অনেক লোকও খাইত। নরেন্দ্রনাথ পাঠ্যাবস্থায় ফরাসী রন্ধনের পুস্তক ক্রয় করিয়া নিজেও অনেক

প্রকার রন্ধন শিখিয়াছিলেন। সেদিনকার রন্ধনও অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং তথায় আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল।

মিরাট পর্যন্ত সকলে একত্রিত ছিলেন। এই স্থান হইতেই নরেন্দ্রনাথের ঘোর বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইল। তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী পর্যটন করিবেন স্থির করিলেন। সসঙ্গ অবস্থা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। নির্বাক রমতা সাধু হইয়া একাকী ভ্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার খবর অতি বিরল হইল। এই সময় তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া একটি পাঠশালায় উপস্থিত হইলেন। পাঠশালার ছাত্রেরা মনে করিল যে একটা রমতা সাধু আসিয়াছে, দুইখানা রুটি পাইলে চলিয়া যাইবে সেজন্য বিশেষ কিছু আদর বা সম্মান করিল না।

নরেন্দ্রনাথের ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়ান—নরেন্দ্রনাথের মন তখন অতি বিষন্ন, দূরে একটা স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছাত্রগুলি তখন ব্যাকরণ পড়িতেছিল। অধ্যাপক উপস্থিত ছিল না, ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিবার সময় ভুল অর্থ করিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ যদিও বিষন্ন ও মৌন হইয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ প্রমাদজনক ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি পাঠ্য স্থানটি সংশোধন করিয়া দিলেন। ছাত্ররা তখন সাধুটির ব্যাকরণ জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল এবং পূর্বে কোন সম্মান দেখায় নাই তাহার জন্য লজ্জিত হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ব্যাকরণের অনেক স্থল সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। বালকগণ তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল কিন্তু তিনি আহার করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন।

নরেন্দ্রনাথের মেথরদের হাতে তামাক খাওয়া—নরেন্দ্রনাথ আত্মগোষ্ঠী ত্যাগ করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও বিষন্ন ভাবে একাকী নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়কার ঘটনা যদিও সকলে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত নহে তবে যৎকিঞ্চিৎ ঘটনাক্রমে পরে জানা গিয়াছে তাহাই এখানে সন্নিবেশিত হইল। নরেন্দ্রনাথকে অনবরত প্রশ্ন করিতে বা

সমানভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে অপর কাহারও সাহস হইত না। গিরিশবাবু অনুসন্ধিৎসু লোক। তীক্ষ্ণ প্রতিভা সম্পন্ন গিরিশবাবু হাস্য কৌতুকচ্ছলে নরেন্দ্রনাথকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ এক বার নগ্নপদে রাস্তা দিয়া একাকী চলিয়া যাইতেছেন। পথের ধারে কতকগুলি মেথর বা ভাঙ্গি বসিয়া তামাক খাইতেছে। ক্লান্ত ও তামাকপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ মেথরদিগের প্রতি বারকতক চাহিয়া আপনার পথে চলিয়া গেলেন। কারণ সাধু হইয়া গৈরিক বসন পরিয়া মেথরের হাত হইতে কেমন করিয়া ছিলিম লইয়া তামাক খাইবেন। কিছুদূর যাইয়া তাঁহার মনে অবসাদ আসিল, তিনি পথে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে মেথর ও সাধুর তফাৎ এখনও তাঁহার মনে রহিয়াছে। তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ভাঙ্গিদের কাছে যাইয়া তাহাদের হস্তস্থিত ছিলিম লইয়া তামাক সেবন করিয়া তাহার পর আবার চলিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "তুমি বেজায় তামাক খোর তাই ঝোঁকের মাথায় ভাঙ্গিদের হাত থেকে তামাক খেয়েছ।" নরেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তর করিলেন, "না তা নয়, পাছে মনে ইতর বিশেষ ভাব জাগে ও অহঙ্কার আসে তাই তাদের হাতে তামাক খেয়েছিলুম।"

নরেন্দ্রনাথ ও জনৈক থানাদার—নরেন্দ্রনাথ যখন একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন একটি থানাদার তাঁহার পেছন লইল ও নানারূপ রূঢ় প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে কয়েদ করিবারও ভয় দেখাইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের মন তখন অতি বিষণ্ণ, তিনি মধুরভাবে বলিলেন, "তা চলুননা এরূপ অনিশ্চিত অনাহারে থাকার চেয়ে তবুও তো সেখানে দু'বার খেতে পাওয়া যাবে, সে ত ভাল কথা।" কথাগুলি এমন স্নেহপূর্ণ, বিশাদসূচক নম্রভাবে বলিয়াছিলেন যে থানাদার অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের কিছুদিন কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছিল

না। গরমকালে একদিন শরৎমহারাজের নামে বাংলায় লেখা একখানি পত্র আসিল, খামে জয়পুরের শীল, নাম নাই। চিঠিতে লেখা ছিল, "বরাহনগরের হাতকাটা হাবুদের বাড়িতে একটা ঔষধ আছে সেই ঔষধটা অমুক ঠিকানায় পাঠাইয়া দিও" ইহা ছাড়া আর কোন কথা লেখা ছিল না। কিন্তু চিঠিখানিতে হাতের লেখা ও হাত কাটা হাবুদের নাম শুনিয়া সকলেই নরেন্দ্রনাথের চিঠি মনে করিয়া আনন্দিত হইলেন। শরৎমহারাজ ঔষধটি তদ্রূপই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও রামসানাইয়া—নরেন্দ্রনাথ যখন আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আলোয়ারে যান তখন গুপ্তমহারাজ সঙ্গে ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পরিব্রাজক অবস্থায় যখন আলোয়ারে গিয়াছিলেন তখনকার ঘটনা গুপ্তমহারাজ রামসানাইয়ার নিকট শুনিয়াছিলেন। রামসানাইয়া একটি হিন্দুস্থানি রমতা বৈষ্ণব। তাহার একটি সহস্র তালিমারা ঘটি ছিল আর একটি ছোট নুড়ি ছিল। রামসানাইয়ার আনন্দ হইলে সেই নুড়িটি দিয়া ঘটিটি বাজাইয়া ভজন গাহিতেন। তিনি মাধুকরী করিয়া কিছু আটা আনিতেন তাহাতে নুন ও লঙ্কা মাখিয়া ধুনি জ্বালাইয়া টিক্কর করিয়া লইতেন। নরেন্দ্রনাথ ও রামসানাইয়া অনেক সময় সেই টিক্কর ও জল খাইয়া দিন কাটাইতেন আর রামসানাইয়া যোগাড় করিয়া একটু দা-কাটা তামাক আনিতেন এবং দুইজনে স্ফূর্তি করিয়া একত্রিত হইয়া তামাক খাইতেন ও ঘটি বাজাইয়া ভজন গাহিতেন। অনাহার, দুঃখ, ক্লেশ ও আনন্দ যুগপৎ বিরাজ করিত। নরেন্দ্রনাথ একবার গুপ্তমহারাজকে বলিয়াছিলেন, "ওরে রামসানাইয়ার সঙ্গে যে কয়দিন ছিলুম বড়ই আনন্দেতে দিন কেটেছে জগতের প্রতি দিকপাত্ কত্তুম না, দেহটা তুচ্ছ মনে কত্তুম। রামসানাইয়া বড় সরল প্রাণের লোক, অকপট ভাবে আমায় ভালবাসত।"

জনৈকা বৃদ্ধার হাতে নরেন্দ্রনাথের টিক্কর খাওয়া—নরেন্দ্রনাথকে আলোয়ারে কেহই বিশেষ সেবা বা আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেয় নাই। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পাঁচ বাড়িতে চাকি পিষিয়া বা আটা

ভাঙ্গিয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু আটা পাইত। বৃদ্ধা সেই আটা হইতে রুটি করিয়া নিজে ও নরেন্দ্রনাথকে খাওয়াইয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথকে "লালা" বা বৎস বলিয়া ডাকিত। যখন রাজঅভ্যাগত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ স্বগোষ্ঠী লইয়া আলোয়ারে যান গুপ্তমহারাজ তখন সঙ্গে ছিলেন। একদিন প্রাতে স্বামীজী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন, সঙ্গে রাজা, রাজকর্মচারীগণ এবং অন্যান্য সকলেও ছিলেন। কিয়ংদূর গমন করিয়া স্বামীজী সহসা একা অন্তর্ধান হইলেন। কেহই আর স্বামীজীকে দেখিতে পাইল না। তখন সকলে স্বামীজীকে খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে পাথর কুড়াইয়া ও ডালপালা দিয়া একটা ঝুপড়ি দেখিয়া তাহার ভিতর লোক উঁকি মারিতে লাগিল। সকলে দেখিল যে সেই ঝুপড়ির ভিতর এক বৃদ্ধা সম্মুখের উনুনেতে একটু আগুন করিয়া বসিয়া থালাতে আটা মাখিতেছে আর স্বামীজী বালকের ন্যায় হাঁটু দু'টি তুলিয়া বৃদ্ধার নিকট বসিয়া আছেন। রাজকর্মচারীদের উঁকি মারিতে দেখিয়া বৃদ্ধা ভীতা হইল। কিন্তু স্বামীজী ইঙ্গিত করায় তাহারা সকলে বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা পূর্বভাবে স্বামীজীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন "আরে লালা, এক বড় সাধু এসেছে শুনেছিস? রাজার বাড়িতে থাকে, সঙ্গে অনেক লোক, আর কত লোক তাকে দেখতে যায়। তুই তাকে দেখতে যাবি? না, তোর ক্ষিদে পেয়েছে, আমি একখানা টিক্কর করে দিই তুই খা তারপর নয় সেই সাধুকে দেখতে যাবি। সে সাধু বড় লোক তোকে কি সেখানে ঢুকতে দেবে?" স্বামীজী বৃদ্ধার সরল অমায়িক স্নেহ দেখিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। তখন হৃদ্‌গত ভাব সম্বরণ করিয়া স্বামীজী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মায়ি, তুই যেই সাধুকে দেখতে যাবি? —আমি সেই সাধু।" বৃদ্ধা মনে করিলেন যে লালা কৌতুক করিতেছে সেইজন্যে বৃদ্ধা পুনরায় বলিলেন, "তুই ত মেরা লালা (অর্থাৎ আমার ছেলে)। তুইও গরীব আমিও গরীব" এই বলিয়া উনুন হইতে গরম গরম দুইট টিক্কর বাহির করিয়া ছাই ঝাড়িয়া স্বামীজীর হাতে দিলেন

এবং স্বামীজীও অতি শুদ্ধ পবিত্র অন্ন বলিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিয়া খাইতে লাগিলেন। কারণ পরিব্রাজক অবস্থায় যখন কেহই অন্ন দেয় নাই তখন এই বৃদ্ধা স্বামীজীকে নিজের অন্ন হইতে শুকনা রুটি দিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। আলোয়ার হইতে প্রত্যাবর্তন কালে স্বামীজী সেই বৃদ্ধার কাছ হইতে বজরা বা পাঁচ মিশেলি আটার টিক্কর লইয়া ট্রেনে আসিলেন এবং নিজে একটু খাইলেন ও অন্যসকল-কেও একটু দিলেন। স্বামীজী পুনরায় বলিয়া দিলেন যে, বেলুড় মঠে যেন তাঁহার ঘরে ইহা রাখিয়া দেওয়া হয় কারণ বৃদ্ধার রুটি অতি শুদ্ধ পবিত্র জিনিস।

খেতড়িরাজ্যের রাজা অজিত সিং ও নরেন্দ্রনাথ—জয়পুর দেশে ছোট ছোট অনেক রাজ্য আছে। সেখাবতি বিভাগে খেতড়ি নামক একটি ছোট রাজ্য আছে। অজিত সিং নামে রাজা তখন রাজত্ব করিতেন। এই রাজা অজিত সিংহের সহিত কি প্রকারে নরেন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ হয় বর্তমান লেখক তাহা বিদিত নহেন। কিন্তু এই খেতড়ির রাজা প্রথম নরেন্দ্রনাথের রাজা-শিষ্য হইয়াছিলেন এবং একান্ত অনুগত ছিলেন।

রাজা অজিত সিং নরেন্দ্রনাথকে অতীব শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং ধর্ম বিষয় নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতেন। স্বামীজীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য আছে বুঝিতে পারিয়া তিনিও সর্ব বিষয়ে আবশ্যক মত উপদেশ লইতেন। মুনসী জগমোহনলাল রাজা সাহেবের দেওয়ান বা প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রাজা অজিত সিংহের ডানহাতস্বরূপ। মুনসীজী ইংরাজী, সংস্কৃত, ফরাসী, উর্দু ও আপন রাজস্থানের ভাষা জানিতেন এবং রাজনীতি ও কার্য কুশলতায় সুদক্ষ ছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক, এইজন্য তিনি নিরামিষ ভোজী ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। তিনি আহ্নিক-পূজা নিষ্ঠাভাবে করিতেন। মুনসী জগমোহনলাল নরেন্দ্রনাথের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ অনুগত ভক্ত হইয়া ছিলেন। রাজসভার অল্পবিস্তর সকলেই এই সময় নরেন্দ্র-

নাথের শিষ্যস্বরূপ হন। যাঁহারা আপনাদিগকে শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন না, তাঁহারাও নিতান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় খেতড়ি রাজ্যের সর্বপ্রকার উন্নতি হইতে লাগিল এবং রাজসভা সর্বদা খুব জাকজমকপূর্ণ ও সাধু পণ্ডিতদের আদরণীয় হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ এক এক সময়ে এক এক ভাবের কথা কহিতেন। যখন সাধুর ন্যায় খুব ত্যাগ বৈরাগ্য সাধনভজনের কথা কহিতেন, তখন সকলের মন সাধনমার্গের দিকে চলিত। আবার অন্য সময় দর্শন শাস্ত্রের কথা হইতেছে। কখন বা সাধারণ ইতিহাস, বিশেষতঃ রাজস্থানের ইতিহাস এমন ভাবে বলিতেছেন যে তাহা শুনিয়া সকলেই গরম হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের পূর্ব কীর্তি স্মরণ করিয়া ভিতরে ভিতরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং বাহিরের অবস্থা দেখিয়া আবার বিষাদ আসিতেছে।

কখন কিরূপে রাজ্য চালাইতে হয় সে বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ প্রধান মন্ত্রীর ন্যায় বুঝাইয়া দিতেছেন, কখন বা সাধন ভজন সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন, আবার কখন বা তিনি হাস্য কৌতুক করিতেছেন। সময় সময় আবার ভজন গাহিতেছেন। খেতড়ি রাজার সহিত অবস্থান সময়ের কথা বর্তমান লেখক মুন্সী জগমোহনলালের কাছ হইতে শুনিয়াছিলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজ রাজপুতনা হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনিও সামান্য কিছু বলিয়াছিলেন। একদিন রাজবংশের উৎপত্তির কথা আরম্ভ হইলে সকলেই বিশেষ আগ্রহ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। টডের 'রাজস্থান' খানা নরেন্দ্রনাথ যেন মুখস্থ আওড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। সকলেই খুব উৎফুল্ল; কোন্ কোন্ রাজারা চন্দ্রবংশীয়, কোন্ কোন্ রাজারা সূর্যবংশীয় ও কোন্ কোন্ রাজারা হরিকুলবংশীয় সেই সব বিষয় নানারকম কথাবার্তা হইতে লাগিল। ক্রমেই কথাটা গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই নিজের মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং আপন আপন বংশ গৌরবে বিশেষ স্ফীত হইতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও জনৈক মুসলমান—একটি স্থানীয় রাজপুত মুসলমান গাইয়ে তথায় বসিয়াছিলেন, তিনি রাজসভায় ধ্রুপদ গাহিতেন। খাঁ সাহেব নরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগত ভক্তছিলেন। খাঁ সাহেব সহসা বলিয়া উঠিলেন, "স্বামীজী, কেউ ত চন্দ্রবংশ, কেউ ত হল সূর্যবংশ : আমি ত রাজপুত, আমি কোন বংশ ?" নরেন্দ্রনাথ গাম্ভীর্য ও হাস্যপূর্ণ মুখে হঠাৎ বলিলেন, "খাঁ সাহেব চন্দ্রবংশী, সূর্যবংশী ত পুরাণ কথা হয়ে গেছে, তুমি হচ্ছ গিয়ে তারাবংশী।" খাঁ সাহেব এবং অন্যান্য সকলে এই তাজা কথা ও ঠাট্টা শুনিয়া মহাআনন্দ করিতে লাগিলেন। খাঁ সাহেব তদবধি আপনাকে সকলের নিকট তারাবংশী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

খাঁ সাহেব ও বর্তমান লেখক—কলিকাতায় কটন ষ্ট্রীটে মুন্সী জগমোহনলালের কাছে আসিয়া খাঁ সাহেব কিছু দিন ছিলেন। বর্তমান লেখক তখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার সহিত বর্তমান লেখকের স্বামীজীর সম্বন্ধে নানাপ্রকার পূর্ব কথা হইতে লাগিল। খাঁ সাহেব গৌরব করিয়া আপনাকে তারাবংশী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বলিতে লাগিলেন, "স্বামীজী আমাকে এই নাম দিয়াছেন, এ আমায় জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাধি।" কিন্তু পরক্ষণেই খাঁ সাহেব একেবারে বিষণ্ণ হইয়া দেওয়াল ঠেস দিয়া হাঁটু দুইটি তুলিয়া ভিতরে কি ভাবিতে লাগিলেন। চক্ষুতে জল আসিল, খানিকক্ষণ পরে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাজাসাহেব ত চলিয়া গিয়াছেন, স্বামীজীও চলিয়া গিয়াছেন, আমাদের আর বাঁচিয়া থাকার কি দরকার আছে ? সে সব দিনের কথা মনে করিলে এক অপূর্ব স্মৃতি আসে। কি সৎ চর্চায়, কি সৎ প্রসঙ্গেই আমাদের দিন কাটিত, রাজা প্রজা ভুলিয়া গিয়া আমরা সকলে যেন এক হইয়া গিয়াছিলাম, সকলেই স্বামীজীর ভক্ত, সকলেই স্বামীজীর শিষ্য, সেদিন কি আর ফিরিয়া আসিবে।" এই বলিয়া খাঁ সাহেব বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। মুন্সী জগমোহনলাল স্বামীজীর প্রিয় দুই একটি ভজন গাহিতে

বলিলেন। খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বর আসিল না, মুখে কথাও ফুটিল না; বরং অধিকতর বিষণ্ণ হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন এবং দুই চক্ষু জলে ভিজিয়া গেল। খাঁ সাহেব স্থির হইয়া যাইলে মুন্সী সাহেবও এই সময় বড় ব্যথিত হইলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুন্সী জগমোহনলাল ধৈর্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "স্বামীজী চাঁদবারদের (চাঁদ কবির কবিতা) শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন; তাহার মধ্যে এইটি অন্যতম,"—এই বলিয়া চাঁদ কবির একটা বর্ণনা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে বৃদ্ধ জরাগ্রস্থ মুন্সী জগমোহনলাল যুবা তেজস্বী হইয়া উঠিলেন, কণ্ঠস্বর ক্রমে গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং মুখের ভাবভঙ্গি বীর পুরুষের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। আবৃত্তি সমাপ্ত করিয়া তিনি বর্তমান লেখককে অর্থ বুঝাইয়া দিলেন,—যোদ্ধাগণ অশ্বারোহণে পর্বত শৃঙ্গে এক গড় অধিকার করিতে উঠিতেছে এবং বিপক্ষগণ প্রতিরোধ করিতেছে, বর্শা ও তলওয়ারের ঝন্ ঝন্ শব্দ, অশ্বপদ বিক্ষেপের খট্‌খট্ শব্দ এইরূপ সুন্দরভাবে ও সুললিত ছন্দে বর্ণিত যে, যেন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তৎপরে মুন্সী জগমোহনলাল বলিলেন, "স্বামীজী খেতড়িতে অবস্থানকালে ঐরূপ কোন না কোন উচ্চ চর্চা লইয়া মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।" তিনি পুনরায় বলিলেন "ইহা হইতে সামান্য একটু মাত্র আভাষ পাওয়া যায় যে স্বামীজী খেতড়িতে কি ভাবে ছিলেন।"

মুন্সী জগমোহনলাল—মুন্সী জগমোহনলাল আরও বলিলেন যে, "স্বামীজী জাপান ও আমেরিকা হইতে রাজা সাহেবকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সে সব পত্রগুলি রাজবাড়িতে বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা মরিয়া যাওয়ায় রাজ্য এখন অপরের হস্তগত হইয়াছে, যদি কখন সুবিধা হয় তাহা হইলে পত্রগুলি ও স্বামীজীর ব্যবহৃত দ্রব্যগুলি বাহির করিতে চেষ্টা করিব।"

নরেন্দ্রনাথ যদিও পূর্ব পরিচিত ব্যক্তির কাছে নরেন্দ্রনাথ নামে অভিহিত হইতেন ও সেই ভাবেই নাম লিখিতেন কিন্তু খেতড়ি অবস্থান-

কাল হইতে তাঁহাকে আলাপী ও ভক্ত-মণ্ডলীরা স্বামীজী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

রাজা অজিত সিংকে স্বামীজীর আশীর্বাদ করা—রাজা অজিত সিংহের দুটি মাত্র কন্যা হইয়াছিল কোন পুত্র হয় নাই। স্বয়ং পোষ্যপুত্র এবং তাঁহার পিতা ফতেচাঁদ সিংও পোষ্যপুত্র ছিলেন। এইজন্য রাজা সাহেব বড়ই বিষণ্ণ হইয়া এক সময় স্বামীজীকে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হউক এইরূপ আশীর্বাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজীর আশীর্বাদে রাজা অজিত সিংয়ের একটি পুত্র সন্তান জন্মে। এই কারণবশতঃ রাজা সাহেব ও রাণী সাহেবা স্বামীজীর একান্ত অনুগত ভক্ত হইয়া উঠেন।

ইংরাজীতে "খেতড়ি রাজবংশের ইতিহাস" বেলুড় মঠের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। কথাপ্রসঙ্গে রাজা সাহেব জানিতে পারিলেন যে স্বামীজীর মাতা ও আত্মীয়েরা আছেন। তাঁহাদের সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য রাজা সাহেব উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। শরৎমহারাজ, যোগেন-মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয়কে রাজা সাহেব স্বামীজীর বাড়ির খবর পাঠাইতে একখানি পত্র লিখেন এবং তাহাতে এ কথা কাহাকেও প্রকাশ করিতে নিষেধ ছিল। তদবধি রাজা সাহেব স্বামীজীর মাতাকে প্রণামী-স্বরূপ মাসিক ১০০৲ টাকা জগমোহনলালের মারফৎ পাঠাইয়া দিতেন। রাজা সাহেব যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তিনি টাকা সমান ভাবে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা সাহেব তাঁহার পুত্রের উৎসব উপলক্ষেও প্রণামীস্বরূপ স্বামীজীর মাতাকে ১০০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন লণ্ডনে অবস্থান কালে স্বামীজী কথা প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন, "রাখালকে তখন বল্লুম যে খেতড়ির রাজা মঠে মাসিক ১০০ টাকা দিতে রাজি হয়েছেন, নে না, রাখাল তখন ঘোর বৈরাগ্য দেখাতে লাগলো, নিলে না—কষ্টে মরতে লাগলো। তাই ত আমি রাখালের উপর চটে গেলুম।"

রাজা সাহেবের লেখককে স্বহস্তে পত্র লেখা—রাজা সাহেব

নরেন্দ্রনাথের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে প্রতি মাসে তিনি দুইখানি করিয়া পত্র স্বহস্তে বর্তমান লেখককে লিখিতেন। রাজা বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলিয়া কোন ভাব থাকিত না; কেবল তিনি যে স্বামীজীর অনুগত ভক্ত সেই ভাবটি পত্রে প্রকাশ পাইত। মুন্সী জগমোহনলালও নিজে আত্মীয়বোধে সর্বদাই পত্র লিখিতেন এবং প্রত্যেকের নাম করিয়া খবর লইতেন।

গঙ্গাধর মহারাজ কিছুদিন খেতড়ির রাজার কাছে বাস করিয়াছিলেন এবং বালকের ন্যায় সরল স্বভাব ও হাস্য কৌতুকে বিশেষ নিপুণ থাকিবার জন্য অল্পদিনের মধ্যে সকলের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সকলেই বেশ মন খোলসা করিয়া গঙ্গাধরমহারাজের সহিত সরল ভাবে মিশিতেন।

রাজা সাহেব ও জনৈক পাঞ্জাবী সাধু—একদিন রাজা সাহেব মন্ত্রীগণ লইয়া কোন এক বিষয় পরামর্শ করিতেছেন এমন সময় এক পাঞ্জাবী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা সাহেবের অনুমতি না পাইলে কাহারও সম্মুখে আসিবার ক্ষমতা ছিল না কিন্তু সাধু বিবেচনা করায় কেহ প্রতিরোধ করে নাই। সাধুটি রাজা সাহেবের কাছে বসিয়া একেবারে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া কথা কহিতে লাগিল। সাধুর ব্যবহার দেখিয়া অস্ত্রধারী প্রহরীরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সাধুকে নিবারণ করিবার জন্য সক্রোধে কথা কহিতে লাগিল।

রাজা সাহেব তেজস্বী রাজপুত হইলেও স্বামীজীর কাছে দীক্ষা লইবার পর হইতে এরূপ নম্র হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি ভিতরকার ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পাঞ্জাবী সাধুটির সহিত কথা কহিতে লাগিলেন এবং ক্রুদ্ধ প্রহরীদিগকে ক্রোধ সম্বরণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজা সাহেব সাধুটিকে ভোজন করিবার জন্য অনুনয় করায়, ক্রোধান্বিত সাধুটি বলিল, 'আমি পরিশ্রম না করিয়া কাহার প্রদত্ত আহার ভোজন করি না।' তখন এক বিষম সমস্যা উঠিল যে সাধুটি অভুক্ত থাকিতে তাহাকে কি কার্য দেওয়া যাইতে পারে এবং সেই বিষয় লইয়া সকলে ভাবিতে

লাগিলেন। অবশেষে সাধুটি চাকি বা জাঁতা চাহিল। ভৃত্যেরা অল্প পরিমাণে গম আনিয়া দিলে সাধুটি বলিল, 'এক পোয়া গম ভাঙ্গিয়া একজন লোকের আহার উপার্জনের মত পরিশ্রম হয় না।' অবশেষে ভৃত্যেরা বিরক্ত হইয়া বেশী পরিমানে গম আনিয়া দিল সাধুটি তখন গম ভাঙ্গিয়া পরিতুষ্ট হইয়া ভোজন করিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া রাজা সাহেব কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন, "পাঞ্জাবী গৃহী ভাল, পাঞ্জাবী সাধু ভাল নয়।"

অখণ্ডানন্দ স্বামীর রাজপুতনায় গমন—স্বামীজী খেতড়ি হইতে বহির্গত হইয়া রাজপুতনার কয়েকটি স্থানে রমতা সাধুর ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সকল ভ্রমণের বিষয় কেহই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে না কারণ তাঁহার মনের ভাব তখন অতি বিষণ্ণ ও বৈরাগ্যপূর্ণ ছিল। কোন প্রকার সম্পর্ক তিনি কাহারও সহিত রাখিতেন না। তাঁহার খবর একবার গুজরাটে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছিল। গঙ্গাধর মহারাজ সন্ধান করিয়া খেতড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সাহেব ও তাঁহার বাড়ির লোকেরা গঙ্গাধরমহারাজকে বিশেষ সম্মান করিয়া তাঁহাদের নিকট রাখিলেন। রাজপুতনায় গোল বা গোলাম বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে তাহারা রাজপরিবারে প্রতিপালিত হয়। তিনি সহৃদয় ভাবে সেই গরীবদিগের উপকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরমহারাজ তাহাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনা ও তাহাদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করায় রাজকর্মচারীরা একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে একবার স্বামীজী বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গা সন্ন্যাসী, তারা রাজা, তাদের রাজকর্মের পলিটিক্সে হাত দিতে গেছলো কেন? এই জন্যই ত রাজা অজিত সিং একটু বিরক্ত হয়েছিল।"

এই সময় গঙ্গাধরমহারাজ উদয়পুর প্রভৃতি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধরমহারাজের নির্ভীক সমালোচনা ও লোকের মুখের উপর উচিত কথা বলায় উদয়পুরে তাঁহার একটু গোলমাল

হইয়াছিল। রাজ সরকার হইতে সাধুদের বেশ বন্দোবস্ত আছে কিন্তু গরীব প্রজাদের অত্যন্ত কষ্ট দেখিয়া তিনি নির্ভীকভাবে দুই একটি তীব্র কথা বলিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া রাজকর্মচারীরা একটু ক্ষুন্ন হইয়াছিল।

অখণ্ডানন্দ স্বামী ও জনৈক কর্মপ্রার্থী বাঙ্গালী যুবক—স্বামীজীর জীবনের সহিত অনেকেরই উপাখ্যান সংমিশ্রিত আছে সেইজন্য সময় সময় তাহাদেরও কথা কিছু কিছু বলিতে হয়। একবার একটি বাঙ্গালী যুবক রাজপুতনায় যায় এবং গঙ্গাধরমহারাজের নিকট আশ্রয় লয়। গঙ্গাধরমহারাজ চাকরি করিয়া দিবার আশা দিয়াছিলেন। অবশেষে গঙ্গাধরমহারাজ একটি ছোট রাজার নিকট বাঙ্গালী যুবকটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ছোট রাজা ত্যাগী গঙ্গাধরমহারাজকে দেখিয়া অতি সম্মান করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া আপন স্থানে বসাইলেন। কিন্তু কর্মপ্রার্থী বাঙ্গালী যুবকটি কোন বিবেচনা না করিয়া রাজ আসনের এক পার্শ্বে বসিলে রাজা ও অপর সকলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে তৎস্থান হইতে দূরে বসাইয়া দিল। যুবকটি অবিবেচক, সে জানিত না যে সাধু ও কর্মপ্রার্থীতে কত প্রভেদ।

স্বামীজী রাজপুতনা পরিদর্শন করিয়া গুজরাটের দিকে চলিয়া যান এবং তথা হইতে পুনা, বেলগাঁও হইয়া মাদ্রাজের দিকে যান। এদিকে রাজা অজিত সিংয়ের একটি পুত্র সন্তান হইল এবং সন্তানটির নামকরণ বা শুভকার্যের জন্য রাজা সাহেব স্বামীজীর বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাজা সাহেব মুন্‌সী জগমোহনলালকে স্বামীজীর অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন মুন্‌সীজী অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে স্বামীজী মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছেন। মুন্‌সীজী মাদ্রাজে গিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং খেতড়ি রাজ্যে পুনরায় তাঁহাকে একবার যাইবার জন্য অনেক অনুনয় করিতে লাগিলেন। স্বামীজী মুন্‌সীজীর সহিত খেতড়িতে ফিরিয়া আসেন বা আশীর্বাদ করিয়া পাঠান বর্তমান লেখকের তাহা মনে নাই। কারণ

মুনসী জগমোহনলালের সহিত বর্তমান লেখকের স্বামীজীর সম্বন্ধে বহু কথাবার্তা হইত। স্বামীজীর কথা বলিতে বলিতে মুনসীজী এত উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন এবং আপন ভাবেতে বিভোর হইয়া যাইতেন যে, এই সমস্ত ছোট কথা তখন আর মনে থাকিত না। যাহা হউক রাজকুমারের নামকরণ বা রাজবংশের প্রথা অনুযায়ী কোন শুভ কর্ম হইয়াছিল।

রাজা সাহেবের প্রথমা কন্যার বিবাহ—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সাহেবের প্রথমা কন্যার সহিত শাপুরের রাজার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ উপলক্ষে রাজা সাহেব খুব ধুমধাম করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন। যোগেন মহারাজ, শরৎমহারাজ ও সান্যালমহাশয় ইঁহারা তিন জনে পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালা দেশের উপযোগী ঢাকাই শাড়ী, ধান, দূর্বা ও সিঁদুর আশীর্বাদ যৌতুকস্বরূপ তথায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ ইহা বাঙ্গালা দেশের প্রথা রাজপুতনার প্রথা নয়। মুনসী জগমোহনলাল একবার বর্তমান লেখককে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বর্তমান লেখক মুনসীজীকে বুঝাইয়া দেন যে, ধান অর্থে লক্ষ্মী বা অন্ন, দূর্বা অর্থে পৃথিবী বা ভূমি, সিঁদুর সধবার চিহ্ন সেইজন্য বাঙ্গালা দেশে এই সব জিনিস দিয়া নববধূকে আশীর্বাদ করে। মুনসী জগমোহনলাল ইহা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

মাদ্রাজে স্বামীজী ও মুনসী জগমোহনলাল—স্বামীজী আমেরিকা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন এই খবর শুনিয়া রাজা সাহেব মুনসী জগমোহনলালের সঙ্গে টাকা দিয়া তাঁহাকে স্বামীজীর নিকট মাদ্রাজে পাঠাইয়া দেন। মুনসী জগমোহনলাল স্বামীজীর সহিত বোম্বাইয়ে আসিয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দেন। মুনসী জগমোহনলাল স্বামীজীর সঙ্গে টাকা দেন বা পরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা বর্তমান লেখককের জানা নাই। রাজা সাহেব বর্তমান লেখককে স্বামীজীর চিকাগো যাত্রার বিষয় জানাইলেন এবং স্বামীজীর আসল চিঠিগুলি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়া জাপান (কোবি) হইতে পত্র

গুলির নকল করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সেই পত্রগুলি শরৎমহারাজ পড়িয়া বিশেষ আনন্দ করিতে লাগিলেন।

চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজীর যশোরাশি যখন সমস্ত ভারতব্যাপী পরিব্যাপ্ত হইল তখন রাজা সাহেব দরবার করিয়া এক অভিনন্দন পত্র স্বামীজীর নিকট প্রেরণ করেন এবং স্বামীজীও চিকাগো হইতে রাজা সাহেবকে সেইভাবে অভিনন্দন পত্রের সুবিখ্যাত প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। রাজা সাহেবের ক্রমশঃ স্বামীজীর উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

রাজা সাহেবের দেহত্যাগ—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসব দর্শন করিবার জন্য রাজা সাহেব লণ্ডনে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তন করিয়া কাশ্মীর দর্শন করিতে যান। কিন্তু জয়পুরের মহারাজার সহিত রাজা সাহেবের বিতণ্ডা হওয়ায় রাজা সাহেব বড়ই বিষন্ন হইয়া পড়েন। রাজা সাহেব আগ্রায় আকবর বাদসার সমাধি সিকান্দ্রা দর্শন করিবার জন্য তথায় যান, সঙ্গে শাপুরের জামাতা ও মুনসী জগমোহনলাল ছিলেন। রাজা সাহেব যেন একটু পরে যাইবেন এইরূপ ভাণ করিয়া সকলকে সরাইয়া একেবারে তিনি উপরকার মিনারে উঠিয়া তোরনের দিকে বাহিরে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপে স্বামীজীর এক বিশেষ ভক্ত রাজা শিষ্য স্বর্গলোকে গমন করেন। রাজা সাহেবের পুত্র ১১ বৎসর বয়স হইলে তাহারও হঠাৎ দেহত্যাগ হয়। খেতড়ি রাজ্যের উত্তরাধিকারী না থাকায় রাজ্য অপর বংশে চলিয়া যায়। কারণ রাজপুতনায় দৌহিত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয় না। সেই সব কারণের জন্য স্বামীজীর পত্রাদি এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিও রাজগৃহে রহিয়া গেল; বোধহয় তাহা আর পাইবার কোন আশা নাই।

মুনসী জগমোহনলাল এই বিপদে সর্বস্বান্ত হইয়া যান। তিনি গরীবভাবে কলিকাতায় এক মাড়োয়ারির আশ্রয়ে কয়েক বৎসর বাস করেন। তাঁহার উন্নতির সময় যে সমস্ত মাড়োয়ারি সম্মুখে যাইতে

সাহস করিত না তাহারা তখন তাঁহাকে আশ্রিত বলিয়া আদেশ করিতে লাগিল। একদিন বর্তমান লেখক সেই মাড়োয়ারির বাড়িতে পস্থিত ছিলেন। তখন আদেশ বাক্য শুনিয়া মুনসী জগমোহন-লালের চক্ষে জল আসিল এবং নিজের অদৃষ্টের প্রতি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজীর কথা শুনিলে তিনি তাঁহার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গিয়া আবার পূর্বেকার মত মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। কয়েক বৎসর পর তিনি আলোয়ার মহারাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইয়াছিলেন এবং রাজরতন বা "রাজ-রত্ন" উপাধি পাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি আলোয়ারেই বাস করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় মুনসী জগমোহনলাল—একবার তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং "বিবেকানন্দ সমিতির" বাৎসরিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এমন বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আলোয়ারে অবস্থানকালে জীবনের শেষ সময় তিনি স্বামীজীর প্রসঙ্গ লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিতেন। সম্ভবতঃ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। স্বামীজীর তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন সেই জন্য তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইল।

স্বামীজী ও জনৈক ভাঙ্গি—যদিও খেতড়ির রাজা অজিত সিংয়ের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ ও সৌহার্দ হইয়াছিল কিন্তু তাহার পূর্বাপর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে স্বামীজীর মনোভাব এই সময় বড়ই বিষণ্ণ ছিল। গুপ্ত মহারাজ একটি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন কিন্তু কোন্ স্থানে হইয়াছিল তাহা ঠিক স্মরণ নাই। স্বামীজী একবার রমতা সাধুর ন্যায় এক ছোট রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। অনেক লোক আসিয়া স্বামীজীর সহিত কথা কহিতে লাগিল। সারাদিনই লোক আসিতেছে, সারাদিনই লোক কথা কহিয়া চলিয়া যাইতেছে। দুপুর গেল, বৈকাল গেল, সন্ধ্যা গেল তবুও লোকের ভিড় কমিল না এবং খাইবার কথাও কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিল

না বা কেহ কিছু দিলও না। এইরূপে দুই এক দিন গেল। স্বামীজী তখন এক রকম অজগরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কেহ আহার না দিলে তিনি চাহিয়া খাইবেন না। একটি ভাঙ্গি বা মেথর রাস্তা ঝাড়ু দিত আর সমস্ত ব্যাপার দেখিত। যদিও জাতিতে সে ভাঙ্গি কিন্তু তাহার ভিতর দয়ার ভাব ছিল। সে দেখিল যে একটি সাধুর কাছে দলে দলে লোক আসে যায় কিন্তু সাধুটা খাইল কি না খাইল সে বিষয় ত কেউ একবারও জিজ্ঞাসা করে না। দুই এক দিন এইরূপে যাইল অথচ কাহাকেও কিছু আহার্য আনিতে না দেখিয়া একটু অবসর পাইয়া ভাঙ্গি স্বামীজীকে বলিল, "এইত এত লোকজন আসছে যাচ্ছে কিন্তু আপনি কিছু খেয়েছেন কি ?"

স্বামীজী সেই ভাঙ্গিকে স্পষ্ট বলিলেন যে কয় দিন তিনি প্রায় অনাহারে রয়েছেন। সেই কথা শুনিয়া ভাঙ্গি তখন চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া স্বামীজীকে বলিল, "আমি জাতে ভাঙ্গি তা না হলে আপনাকে রুটি আনিয়া দিতাম।" স্বামীজী তাহার দয়ার ভাব শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি আটা নিয়ে এস, রুটি করে নেওয়া যাবে।" ভাঙ্গি তদ্রূপ করিলে স্বামীজী তাহার প্রদত্ত রুটি খাইয়াছিলেন। এই কথা তত্রস্থ রাজার কানে যাইলে রাজা ভাঙ্গিকে দণ্ড দিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু সেই সময় স্বামীজী তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে তীব্রভাবে ভৎর্সনাসূচক কথা মিষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিলেন। রাজা সেই সকল কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গুপ্তমহারাজ এই উপাখ্যানটি বলিবার সময় বলিতেন যে, "জামা-জুতো পরা লোকের চেয়ে মেথর ভাঙ্গির ভিতর প্রাণ আছে।"

স্বামীজীর রাজপুতনা ভ্রমণ—রাজপুতনায় ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সময় স্বামীজী একস্থানে গিয়া পৌছান। তথায় কোন আশ্রয় বা আহারের বন্দোবস্ত না পাইয়া তিনি এক ইঁদারার অনতিদূরে একটি গাছের তলায় গিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণা যখন বেশী পাইত তখন কেহ ইঁদারা হইতে জল তুলিলে তাহার নিকট হইতে

অল্পমাত্র জল লইয়া খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তথায় আহারের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় দুই তিন দিন এই ভাবে জল খাইয়া কাটাইবার পর তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যান। সেই খবর তত্রস্থ রাজার নিকট যাইলে রাজা স্বামীজীকে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজপুতনায় অনেক ছোট ছোট রাজা বা জমিদার আছেন এবং এই ঘটনাটি কোথায় হইয়াছিল তাহা দীনমহারাজ বিশেষ করিয়া বলেন নাই।

স্বামীজীর বিষাদ ভাব—এই সময় স্বামীজীর মনের ভাব বড়ই বিষাদপূর্ণ ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বা কি হইল! কেবল মাত্র পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান এই না! কিছুই ত পাইলাম না, দেহরক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে উরুবিল্ব বা বুদ্ধগয়ায় শীলাখণ্ডে বসিবার পূর্বে বুদ্ধদেবেরও মন এইরূপ ভীষণ বিষাদপূর্ণ হইয়াছিল। গৃধ্রকূট পর্বত হইতে যখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় উরুবিল্ব গ্রামের দিকে প্রস্থান করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "ক্ষুৎ পিপাসা প্রথমশ্চৈব, কামশ্চ দ্বিতীয় স্তথা, সংশয় তৃতীয়শ্চৈব, অহংকার চতুর্থ চ।" বুদ্ধদেবের বিসাদ ভাবের সহিত স্বামীজীর এই সময়কার জীবনের বিষাদভাবের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। স্বামীজী এই সময় যে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও এইরূপ বিষাদ ও গভীর খেদোক্তি পূর্ণ ছিল। সেই সময় আলমবাজার মঠে শরৎ মহারাজ প্রভৃতিদের এইরূপ বিষাদভাব আসিয়াছিল, তাহারা ভাবিতে লাগিলেন কি হইল! শুধু ভিক্ষা করিয়া খাওয়া। জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গেল, কিছুই পাওয়া গেল না ইত্যাদি।

স্বামীজীর ষ্টাডিকে পরিব্রাজক অবস্থার গল্প বলা—লণ্ডন অবস্থান-কালে এক দিন কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহার পরিব্রাজক অবস্থার কথা ই, টি, ষ্টাডিকে বলিতে লাগিলেন, এই সময় তাঁহার মনের ভাব অতি কষ্ট দায়ক হইয়াছিল। জীবন্ত মৃত্যু কাহাকে বলে তাহা তিনি প্রতি-মুহূর্তে অনুভব করিয়াছিলেন। নিজের অনাহার, মাথা গুঁজিবার স্থান

নাই, পথে পথে ভিক্ষা করিয়া পাগলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কোন জিনিস তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় নাই এবং জপ তপ করিয়াও কিছু ফল পাইতেছিলেন না। কতকগুলি ছেলেকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া আনিয়া পথের ভিখারী করিয়াছেন, তাহারা খাইতে পাইতেছে কি না পাইতেছে বা তারা কি করিতেছে সেই এক ভাবনা। পিছনে পুলিশের তাড়া। আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দেখিতেছেন অন্নাভাবে সকলে হাহাকার করিতেছে। কি দুঃখ কষ্টেই না তাহারা দিন কাটাইছে; নিজে ভগবান্ পাইলাম না তাহার উপর লোকেরও কিছু করিতে পারিলাম না ইত্যাদি নানা কথা তিনি বলিতে লাগিলেন। ই, টি, ষ্টার্ডিকে পূর্বাবস্থার কথা বলিতে বলিতে তিনি আবার রম্‌তা সাধু হইয়া গেলেন। পরিব্রাজক অবস্থার সেই সকল ভাব ও ছবি যেন তাঁহার চোখের সম্মুখে আসিতে লাগিল। তাঁহার তেজপূর্ণ গম্ভীর মুখ পরিবর্তিত হইয়া বিষাদপূর্ণ মুখ হইয়া গেল এবং চোখের কোণে জল আসিয়া দাঁড়াইল। সিংহকে শিকলে বাঁধিয়া বনের মধ্যে একটা গাছে আটকাইয়া রাখিলে তাহার যেমন মনের ভাব ও শিকল ছিঁড়িবার চেষ্টা হইয়া থাকে স্বামীজীরও এই সময় মনের ভাব তদ্রূপ হইয়াছিল। এই সময় অর্থাৎ দুই বা আড়াই বৎসর তাঁহার মনের ভাব অতি কষ্টদায়ক হইয়াছিল।

স্বামীজীর জুনাগড়ে গমন—রাজপুতনায় অনেক স্থান রম্‌তা সাধুর ন্যায় ভ্রমণ করিয়া কাঠিয়াওয়াড়ের দিকে চলিলেন। কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ভাবে গিয়াছিলেন তাহা বর্তমান লেখকের বিশেষ জানা নাই তবে তিনি জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারিদাসের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। হরিদাস বিহারিদাসের নড়িয়ার গ্রামে বা নগরে স্বামীজী ঘুরিতে ঘুরিতে যান এবং অল্পদিন থাকিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় হরিদাস বিহারিদাস থাকিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সাধু থাকিবে দুইবেলা দুইমুঠো ভাত খাইবে এইরূপ ভাবে প্রথমে অনুমতি দিয়াছিলেন—বিশেষ আলাপ পরিচয় বা ভক্তি-শ্রদ্ধা কিছুই দেখান

নাই। গুজরাট বা সিন্ধুদেশের আহারাদি বাঙ্গালীর পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক, ডাল সিদ্ধ করিয়া শিলে বাটিয়া হাঁড়ির জলে মিশাইয়া দেয় ও একটু মসলা ও ঘি দিয়া পাতলা জলের মত ডাল খায়। তরকারি নাম মাত্র। ভাত আর একটু ঘি।

লণ্ডনে অবস্থানকালে কাঠিয়াওয়াড়ের জনৈক যুবকের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "সন্ধান করিয়া ঠিক করিলাম কোন্ ব্যক্তি হরিদাস বিহারিদাসের রন্ধন করে এবং তাহার সহিত ভাব করিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে গান শুনাইতাম আর তাহার কাছে এই প্রার্থনা করিলাম যে সে যেন ডালের দানাগুলি একটু আলাদা করিয়া ভাতের সঙ্গে দেয়। তাহা হইলে নুন লঙ্কা দিয়া ডালের বিচিগুলি টাক্না দিয়া দুই এক গেরাস্ ভাত খাওয়া যাইবে। এই ভাবে ত হরিদাস বিহারিদাসের বাড়িতে ভাত খাওয়া যাইত।" পরবর্তী সময় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি একবার স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামীজী, আপনি এত লঙ্কা খান কেন? স্বামীজী গম্ভীর মুখ করিয়া শ্লেষপূর্ণভাবে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মশাই, চির জীবনটা পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি আর বুড়া আঙ্গুলের টাক্না দিয়ে ভাত খেয়েছি। লঙ্কাই ত তখন একমাত্র সম্বল ছিল, ঐ লঙ্কাই ত আমার পুরাণ বন্ধু ও মিত্র। আজকাল না হয় দু'চারটে জিনিস খেতে পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু চিরকালটা ত উপোস করে মরেছি।"

স্বামীজী ও হরিদাস বিহারিদাস—হরিদাস বিহারিদাসের ধারণা ছিল যে স্বামীজী এক জন রমতা সাধু পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, কোন জায়গায় আশ্রয় না পাইয়া তাহার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছেন। বড় মানুষের বাড়ি দুইটি খান-দান তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। হরিদাস বিহারিদাস বোম্বাই সরকার হইতে জুনাগড়ের নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হরিদাস বিহারিদাস নড়িয়ার গ্রামের ধন্যাঢ্য বংশীয়। এক সময় হরিদাস বিহারিদাস অতি বিষন্নভাবে কয়েকদিন রহিলেন, কাহারও সাথে বিশেষ বাক্যালাপ করিতেন না।

স্বামীজী তাঁহার বিমর্ষ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনি সাধু, আপনার এ সকল কথা শুনিয়া কি ফল হইবে? রাজ সরকারে যাহারা চাকরি করে তাহাদের সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়।" কিন্তু স্বামীজী আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন যে, বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট জুনাগড় দরবারকে এক পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রের কি উত্তর হইতে পারে সেই বিষয় লইয়া তিনি ভাবিতেছেন কারণ তিনি নবাবের কর্মচারী আবার এদিকে বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়াছেন। উভয়কূল যাহাতে রক্ষা হয় এরূপ কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না সেইজন্য এত বিমর্ষ।

স্বামীজীর হরিদাস বিহারিদাসকে পত্র লিখিয়া দেওয়া—স্বামীজী হরিদাস বিহারিদাসের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কোন কথা না বলিয়া সম্মুখ হইতে একখানি কাগজ তুলিয়া লইলেন এবং আপন মনে ইংরাজীতে কি লিখিতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইলে তিনি হরিদাস বিহারিদাসকে বলিলেন, "আচ্ছা, এটা কেমন হয় দেখুন দেখি?" হরিদাস বিহারিদাস পত্রখানি পড়িয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ঠিক এই চিঠিই ত চাচ্ছিলাম, এই চিঠিতেই কাজ হবে" এই বলিয়া সেই চিঠির আর কোন পরিবর্তন না করিয়া অবিকল নকল করিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া বোম্বাই সরকারকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার কার্য সফল হইয়াছিল। হরিদাস বিহারিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী আপনি কি ইংরাজী জানেন? এযে দেখছি খুব পাকা হাতের লেখা এবং রাজনীতি বিশেষ ভাবে না জানিলে এরূপ ভাবে কেহ চিঠি লিখিতে পারে না।" হরিদাস বিহারিদাস তদবধি স্বামীজীকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে হরিদাস বিহারিদাস মন খুলিয়া কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন এবং নানা বিষয় প্রশ্ন করিতেন, এমন কি রাজনীতি এবং রাজ্য কিরূপে চালাইতে হয় সে বিষয়েও তিনি প্রশ্ন করিতেন। হরিদাস বিহারিদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং

অন্যান্য আত্মীয়রাও স্বামীজীর বিশেষ অনুগত হইয়াছিলেন। গুজরাট কাঠিয়াওয়াড়, বৈষ্ণব প্রধান দেশ; তথায় মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। সাধুর পক্ষে ত একেবারেই উচিত নয় সেইজন্য স্বামীজীর এই স্থানে মাছ, মাংস ও তামাকের একটু কষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীজীর বোম্বাই গমন—নড়িয়ারে কিছুদিন থাকিয়া গুজরাট কাঠিয়াওয়াড় ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান দর্শন করিয়া স্বামীজী বোম্বাইয়ের দিকে চলিয়া যান। এই সময় তিনি কাহারও সহিত পত্রাদি লিখিতেন না এবং পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ও করিতেন না। মহা বৈরাগ্য ও উন্মনা ভাব। সারদামহারাজ ও গঙ্গাধরমহারাজের সহিত তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখা হইয়াছিল। জীবনের সমস্ত শক্তি একটা কেন্দ্রে আনিয়াছেন—বিজয়ী হইবেন, নয় দেহত্যাগ করিবেন। এইজন্য তাঁহার এই সময়কার খবর বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যায় নাই, অল্পমাত্র নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

হরিদাস বিহারিদাসের কলিকাতায় আগমন—১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে হরিদাস বিহারিদাস অপিয়াম কমিশনের (Opium Commission) সদস্য হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং বড়বাজারের একটি বাড়িতে থাকিতেন। বর্তমান লেখক ও সান্যাল মহাশয় তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং নিতান্ত আপনার লোকের মত তিনি মেলা-মেশা করিতেন। আলমবাজারের মঠে তিনি এক দিন ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তবে সকল কথা এক্ষণে স্মরণ নাই। আমেরিকায় স্বামীজীর সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। আমেরিকায় স্বামীজী তখন খুব বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন সেই সকল বিষয়েই লোকের মন ধাবিত হইয়াছে, পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি কোথায় কি করিয়াছিলেন সে সকল কথা বা বিষয় অতি সামান্য বলিয়া তখন বোধ হইত। সান্যাল মহাশয়ের সহিত তাঁহার বেশ হৃদ্যতা হইয়াছিল তিনি বিদ্রূপ করিয়া সান্যাল মহাশয়কে বলিতেন, "বৈকুণ্ঠ সান্নেল কেন? কথাটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ সান্যাল।'

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হরিদাস বিহারিদাসের পরলোক গমন হয় এবং তদবধি তৎ পরিবারের আর বিশেষ কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

স্বামীজীর পুনায় গমন ও সংস্কৃত অধ্যয়ন—গুজরাট ও অন্যান্য স্থান হইয়া স্বামীজী পুনায় গিয়াছিলেন। কিরূপভাবে পুনায় গিয়াছিলেন এবং তথায় কি কি করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ কিছু জানা নাই; পুনায় গিয়া তিনি খুব সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সে বিষয় পরে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাবুরাম মহারাজ একবার বলিয়াছিলেন, "স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় পুনা সহরে যান। সেই সময় বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের খুব খ্যাতি হইয়াছিল। স্বামীজীর অন্যত্র থাকিবার কোন সুবিধা না থাকায় তিলক মহারাজের বাড়িতে থাকিবার মনস্থ করিলেন এবং গৃহস্বামী সম্মত হইলে স্বামীজী তাঁহার একটি পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতেন ও গৃহস্বামীর নিকট ভোজন করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ পুনা সহরে বিশেষভাবে পাওয়া যায় সেইজন্য স্বামীজী তথায় থাকিতে মনস্থ করিলেন। এই সময় তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন ও সামান্য রমতা সাধু বলিয়া গৃহস্বামীর সহিত বিশেষ বাক্যালাপ বা পরিচয় হয় নাই।

বেলুড় মঠে স্বামীজী ও বালগঙ্গাধর তিলক—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ যখন মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন তখন তিলক মহারাজ সাগ্রহে আপন বাড়িতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া স্বামীজীকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন এবং অপরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যেরূপ সম্মান করিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হয় তিলক মহারাজও সেইভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী টেলিগ্রাম পাইয়া তিলক মহারাজকে প্রত্যুত্তরে উত্তর দেন যে, "অমুক সময়ে অমুক পরিত্যক্ত গৃহে যে সাধুটি আপনার বাড়িতে বাস করিত আমি আপনার সেই পূর্বপরিচিত লোক।" এই উত্তর পাইয়া তিলক মহারাজ বড়ই সম্মান মনে করিয়াছিলেন, কারণ স্বামীজী এক সময় তাঁহার বাড়িতে ছিলেন এবং সেই পূর্ব ভাব অদ্যাপি রাখিয়াছেন। কংগ্রেস উপলক্ষে তিলক মহারাজ

যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি বেলুড় মঠে যাইয়া স্বামীজীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। উভয়ে মঠের মাঠে পায়চারি করিতে করিতে নানা কথাবার্তা কহিতেন এবং সে সময় অন্য কাহারও তথায় যাইবার অধিকার ছিল না। সেইজন্য তাঁহাদের কি কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। নিশ্চয়ানন্দ স্বামী বলেন যে, "তিলক মহারাজ অনেক কার্যের ভাব ও প্রণালী স্বামীজীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।"

ট্রেনে স্বামীজীর জনৈক ব্যক্তির নিকট শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা—এই সময় কোন স্থানে স্বামীজী ট্রেনে করিয়া যাইতেছিলেন, গায়ে গৈরিক পরিচ্ছদ, নির্বাক ও বিষণ্ণ বদন। সেই গাড়িতে কতকগুলি ইংরাজী শিক্ষিত তৎদেশীয় ব্যক্তিও যাইতেছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর চেহারা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই সব সন্নাসীগুলি দেশের এক মহা কণ্টক। একেই তো দেশে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র নিত্য লেগে রয়েছে তাহার উপর এই যণ্ডা লোকগুলি রোজগার করবে না আর পরের অন্ন ধ্বংসাবে" ইত্যাদি কথা তাঁহারা ইংরাজীতে কহিতে ছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে সন্নাসীটি ইংরাজী জানে না। তাহার পর তাঁহারা সংস্কৃত বই হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাদের উদ্ধৃত শ্লোক ও ব্যাখ্যা উভয়ই ভুল হইতেছিল। তাঁহাদের ভুল উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা শুনিয়া স্বামীজী আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং উপযুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন। স্বামীজীর নিকট ইংরাজীতে ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহারা বড়ই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এ লোকটি ভাল রকমই ইংরাজী জানেন এবং তাঁহাদের বিদ্রূপের সমস্ত কথাই বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বামীজী তখন তাঁহাদের সন্ন্যাস ধর্মের উদ্দেশ্য ও ভারতের প্রকৃত অবস্থা বিশদভাবে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও ইংরাজী ভাষার উপর অধিকার দেখিয়া বুঝিতে

পারিস যে, তাঁহারা দিবাকরের কাছে সামান্য প্রদীপ মাত্র। সেই সময় হইতে তাঁহারা স্বামীজীর বিশেষ অনুগত হইয়াছিল।

স্বামীজীর কুতমিলালের গল্প বলা—স্বামীজী যদিও এই সময় অতি বিষন্ন ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া রমতা সাধুর ন্যায় নিজের ইচ্ছামত পর্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্য কৌতুক কখন তিনি বিস্মৃত হন নাই। লণ্ডন অবস্থানকালে একবার স্বামীজী বলিয়াছিলেন,—এক সময় তিনি ট্রেনে করিয়া যাইতেছিলেন, সঙ্গে এমন একটি পয়সা নেই যে কিছু কিনিয়া খান, পূর্ব দিনেও বড় কিছু আহার জোটে নাই। ট্রেনে কতকগুলি বোম্বাই অঞ্চলের লোক ছিল তাহারা বলিলেন, "ইনি হিমালয়ের অনেক স্থান ঘুরিয়া বেড়ান, নিশ্চয় হিমালয়ের নিভৃত স্থানে কুত্‌মিলাল মহাত্মার সহিত ইহার সাক্ষাৎ হইয়াছে।" তাহারা থিওসফিষ্ট ছিল, সেইজন্য হিমালয়ের অলৌকিক ঘটনা ও মহাত্মাদিগের অনেক আজগুবি গল্প সব কহিতে লাগিল। স্বামীজী হাস্য সম্বরণ করিয়া বেশ গম্ভীর মুখে তাহাদের আজগুবি গল্পের সহিত মিশিয়া যাইলেন এবং হঠাৎ তাহাদের বলিয়া উঠিলেন, "কুত্‌মিলালের কথা বলছেন কি, এই কয়দিন আগে কুত্‌মিলালের ভাণ্ডারাতে গেছলুম। সে কি ব্যাপার! এইএত বড় বড় লাড্ডু (নিজের প্রকাণ্ড হাত দেখাইয়া) আর কত যে সাধু ভোজন করেছে তার ইয়ত্তা নাই, সে যে কি ব্যাপার তা আর আপনাদের কি বলবো" এই বলিয়া তিনিও আজগুবি কথা বলিতে সুরু করিলেন। স্বামীজী যে তাহাদের বিদ্রূপ করিতেছেন তা তাহারা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীজীর সহিত মহা উল্লাসে মাতিয়া যাইল এবং আনন্দে স্বামীজীকে ভাল রকম কিছু ভোজন করাইয়া দিল। ভোজনান্তে স্বামীজী একটু সুস্থ হইয়া আবার ভাব পরিবর্তন করিয়া নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে খুব ভং'সনা করিতে লাগিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে এই উপাখ্যানটি তিনি বিশেষ হাস্য কৌতুক করিয়া বলিতেন।

কলিকাতায় স্বামীজীর ফটোগ্রাফ আসা—স্বামীজী বেলগাঁওয়ে কি

ভাবে গিয়াছিলেন সে বিষয় বিশেষ কিছু জানা নাই। পরিব্রাজক বা সাধু যে প্রকারে ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া আশ্রয় লয়, মনে হয় তিনিও সে প্রকারে গিয়াছিলেন। তখন কোন পত্রাদির যাতায়াত ছিল না সেইজন্য খবরাখবরও ছিল না। গরমকালে হঠাৎ একদিন একখানা ফটোগ্রাফ আসিল, কোন ঠিকানা নাই, ছবিওয়ালা সেই ছবিখানি বর্তমান লেখককে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লম্বা চেহারা, পা পর্যন্ত ডবল-ব্রেষ্ট তুলা-ভরা জামা এবং মাথায় পাগড়ি। ছবিটি দেখিয়াই স্বামীজীর চেহারা বুঝিতে পারা গেল এবং শরীরটা একটু শুধরাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। সেই ছবির সহিত পত্রাদি কিছু ছিল না।

যুবক-অধ্যাপকের স্বামীজীর বিষয় বলা—১৯১০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে একটি যুবক-অধ্যাপক কলিকাতায় আসেন এবং স্বামীজীর তিথি-পূজার দিন বেলুড় মঠে যান। তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। এক সময় স্বামীজী তাহাদের বাড়িতে থাকিতেন, তখন তিনি বালক ছিলেন সেইজন্য স্বামীজী তাহাকে লইয়া খেলা করিতেন। দুই হাতের বেড় করিয়া তাহার ভিতর দিয়া কেমন করিয়া নিজের শরীর গলাইয়া লইতে হয় এইটি স্বামীজী তাহাকে শিখাইতেন। সংস্কৃতে ইহাকে "হস্ত চক্রমন" বলে। বালকটি ক্রমে বড় হইয়া কলেজে পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন কলেজে শুনিল যে আমেরিকা প্রত্যাগত বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে বক্তৃতা করিতেছেন। যুবকটি ট্রেনে করিয়া অতি সত্বর মাদ্রাজে যাইল এবং স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনেক চেষ্টার পর স্বামীজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে তাহাদের বাড়ির সেই পূর্ব পরিচিত সাধুটিই স্বামী বিবেকানন্দ এবং যুবকটি আত্মপরিচয় দিলে স্বামীজী তাহাকে চিনিতে পারিলেন।

স্বামীজীর বেলগাঁওয়ে গমন—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদপত্রে স্বামীজীর বেলগাঁওয়ে অবস্থানকালের একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বামীজী যদিও সন্ন্যাসী কিন্তু ইংরাজীতেও কথাবার্তা কহিতেন। দক্ষিণে

তামাক সেবন করা হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ বিশেষতঃ সাধুর পক্ষে। কিন্তু স্বামীজী তামাক সেবন ও সুবিধা হইলে আমিষ আহারও করিতেন। লোকটি বড় প্রীতিকর ও ভিতরে অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল বলিয়া কেহ কিছু আপত্তি করিত না। যদিও রমতা সাধু কিন্তু ওঠা বসা যেন কোন বড় ঘরের ছেলের মত ছিল। কেহ তর্ক করিতে গেলে নম্র, হাস্য-কৌতুক প্রিয় স্বামীজী হঠাৎ ভাব পরিবর্তন করিয়া মহা শক্তিশালী পুরুষ হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিধ্বস্ত করিতেন। স্বামীজীর পড়াশুনা ও খবরাখবর সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক বেশী দেখিয়া সকলে কোন তেজস্বী নূতন প্রকারের সাধু বলিয়া মনে করিত। বেলগাঁও হইতে স্বামীজী দক্ষিণে গমন করেন।

বেলগাঁও পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজী আপনার ইচ্ছামত দক্ষিণে যাত্রা করেন। মহা বিষণ্ণভাবে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আবার একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কন্যাকুমারী দর্শন করিতে যান। এই সময়কার কথা, তাঁহার বক্তৃতা ও চিঠি পত্রেতে কিছু কিছু পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত বিশেষ কিছু জানা নাই।

স্বামীজীর মাদ্রাজে গমন—দক্ষিণে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বামীজী মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন এবং তদানীন্তন সহকারী একাউণ্ট্যাণ্ট্ জেনারল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। নাম ধাম কিছুই জানা নাই, কোন পরিচয় পত্রও নাই, জিজ্ঞাসা করিবারও কাহার সামর্থ নাই, শুধু সাধু ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত এইটি বোঝা যাইতেছিল। শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুত মণীন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিলেন যে, একটি বাঙ্গালী সাধু তাহার কাছে আছেন, বয়স আন্দাজ ৩০-৩২ বৎসর, মুখ গোল, কপালে কাটা দাগ, ভাল গাহিতে পারেন, ইংরাজী লেখাপড়া ভাল রকমই জানেন, হাস্য-কৌতুক প্রিয় ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ ভক্ত, এ লোকটির বিষয় সন্ধান করিয়া আমায় মাদ্রাজে যেন জানান হয় এবং এ সকল কথা যেন গোপন রাখা

হয়। তদনুযায়ী শ্রীযুত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য ৭নং রামতনু বসুর গলির বাড়িতে আসিয়া বর্তমান লেখকের কাছে সব বলেন এবং সমস্ত পরিচয় ও লক্ষণ মিলিয়া যাইলে তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ফিরিয়া যাইয়া মাদ্রাজে সংবাদ পাঠান।

মাদ্রাজ হইতে স্বামীজীর পত্র লেখা—স্বামীজী দক্ষিণের দিকে গিয়াছেন এ কথা পূর্বে জানা গিয়াছিল কিন্তু কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয়তা ছিল না, এক্ষণে হইল। এই সকল কথা শরৎমহারাজ ও সান্যাল মহাশয়কে জানান হইলে পুনরায় পত্র লেখালেখি চলিতে লাগিল কিন্তু স্বামীজীর পত্রের ভাব স্বতন্ত্র হইল। রাজপুতনার পত্রে যেমন শোকের ও বিষাদের ভাব ছিল, কখন বা রাগারাগি বা গালাগালির কথা ছিল তেমনি মাদ্রাজের প্রত্যেক পত্রাদিতে গাম্ভীর্য, সাহস, ভালবাসা ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। পত্রাদি লিখিবার ধাঁচধরণও অন্য প্রকারের ছিল—যেন কোন উচ্চ শ্রেণীর লোক সকলকে আদেশপত্র লিখিতেছেন। প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া খোঁজ খবরও থাকিত এবং শান্তির ভাব ও সম্মুখে যেন কোন মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে এই সকল কথাবার্তা পত্রের প্রত্যেক পংক্তিতেই ছিল। গুপ্ত মহারাজ একবার হাস্য কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ত কিছুই পাইনি, স্বামীজীও কিছু পান নাই তবে ভালবাসার জন্য একসঙ্গে থাকতুম, আর ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম ও গুরু বলে সেবা করতুম।" কিন্তু এই সকল পত্রাদির একটু আধটু যাহা তিনি শুনিতেন তাহাতেই চমকিত ও হর্ষিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আরে বাবা, এখন আর ঠাট্টা তামাসা নয় এখন যে দেখছি কিছু পেয়েছে। এখন সম্মান করে কথা কইতে হবে আর হাসি-তামাসা নয়! আরে তা না হলে কি আমার গুরু হতে পারে? আমার মতন বেয়াড়া লোককে শায়েস্তা করতে না পারলে সে কি কখন আমার গুরু হয়?" গুপ্ত মহারাজ অতি সরল লোক, কথার মারপ্যাচ কিছু জানিতেন না, তাই স্পষ্ট ভাবেই প্রাণের কথা কহিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া সকলেই বড় খুসী হইয়াছিল।

শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের বাড়িতে অবস্থানকালে আলাসিঙ্গার মুখে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল। প্রথমে একটি দুইটি করিয়া লোক স্বামীজীকে দেখিতে আসিল। ক্রমশঃ সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং অল্পদিনের ভিতরেই জন-সংখ্যা অত্যধিক হইয়া উঠিল। রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বহু লোক বসিয়া নানা কথাবার্তা কহিত, —বিশ্রাম নাই, শ্রান্তি নাই। স্বামীজীর সহিত কথা কহিয়া সকলেই বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি আত্ম-গোষ্ঠীর ভিতরও হইল। স্বামীজী একটু সময় পাইলে শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের ছোট কন্যাটিকে গান শিখাইতেন। এবং মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম বাজাইয়া ছোট মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করিতেন।

স্বামীজীর নিজ মাতার শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা—মন্দম্ চক্রবর্তী আলাসিঙ্গা পারুমল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবক পাচাই আপ্পাস কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শিষ্য হইলেন। মহা উদ্যোগী ও সর্ববিষয়ে উৎসাহী হইয়া কার্য করিতে লাগিলেন। আলাসিঙ্গাকে কৌতুকচ্ছলে সকলে "মাদ্রাজের হরমোহন" বলিয়া ডাকিত। এই সময় স্বামীজী এক দুঃস্বপ্ন দেখেন যে তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। এই দুঃস্বপ্নে তাঁহার মনটা একেবারে দুঃখিত হইয়া উঠিল এবং এ সকল কথা কাহাকেও না বলিয়া কেবল তিনি আলাসিঙ্গাকে বলিলেন। সন্ন্যাসী হইয়া গৃহে আর পত্র লিখিবেন না কিন্তু প্রাণটি বড় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং স্বপ্নটি সত্য স্থির করিয়া তিনি শ্রাদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রাদ্ধের কথা শুনিয়া আলাসিঙ্গা স্বামীজীকে বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া কি করিয়া মাতার শ্রাদ্ধ করিবেন ?" স্বামীজী গম্ভীর হইয়া শঙ্করাচার্য যে স্বীয় মাতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সকল বিষয় তাহাকে বলিলেন, কিন্তু কলিকাতার সংবাদ কেহই লইলেন না। অবশেষে আলাসিঙ্গা বলিলেন, "স্বামীজী, কয়েক মাইল দূরে রেলে করিয়া যাইলে এক পিশাচসিদ্ধ আছে সে সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ ঘটনা বলিতে পারে। পারিশ্রমিক স্বরূপ

দশ টাকা লয় এবং কেহ কারণ লইয়া যাইলে বড়ই সন্তুষ্ট হয়। লোকটি অতিশয় কারণপ্রিয় ও শ্মশানে একটি খড়ের ঘরে বাস করে।"

জনৈক পিশাচ-সিদ্ধ—চার পাঁচ জন মিলিয়া একদিন স্বামীজী সেই পিশাচ-সিদ্ধর কাছে যাইলেন। স্থানটি শ্মশান, চারিদিকে হাড়, ছাই, ভস্ম ইত্যাদি ছড়ান রহিয়াছে। একটা বড় গাছ আছে তাহার কাছে একটা মাটির ঘর বাঁধিয়া সেই পিশাচ-সিদ্ধ বাস করে। আলাসিঙ্গা সঙ্গে করিয়া এক বোতল মদ ও দশ টাকা লইয়া গিয়াছিল, সেই দুইটি দিলে সেই পিশাচ-সিদ্ধ তাড়াতাড়ি সেই মদ ও টাকা লইয়া তাহার মাটির ঘরটিতে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিল ও চীৎকার করিয়া কাতরস্বরে নিজের ভাষায় কি বলিতে লাগিল। স্বামীজী সেই চীৎকার শুনিয়া আলাসিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি বলছে? ও চীৎকার করে কেন? আলাসিঙ্গা ইংরাজীতে স্বামীজীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ও বলছে, "ঐ লোকটিকে এখান থেকে চলে যেতে বল, ওর গা থেকে বড় তেজ বেরুচ্ছে তাতে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে, আমি ওর সব কথা বলে দিচ্ছি কিন্তু ওকে এ শশ্মানভূমি থেকে চলে যেতে বল, ও যেন দূরে চলে যায় আমি ওর তেজ সহ্য করতে পারছিনা।" তাহা শুনিয়া স্বামীজী হাস্য করিয়া আলাসিঙ্গাকে বলিলেন, 'দুঃ শ্যালা, মাতাল মাতালস্য নানা ভঙ্গি' এই বলিয়া স্বামীজী সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া দূরে চলিয়া গেলেন এবং একটা ফুলগাছ হইতে ফুল তুলিয়া কখন বা শুঁকিতে লাগিলেন কখন বা চটকাইতে লাগিলেন ও আপন মনে বাংলা গান গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু আলাসিঙ্গা প্রভৃতি শ্মশানে সেই ঘরটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন পিশাচ-সিদ্ধ কতকগুলি কাগজ লইয়া নিজের ভাষায় অনবরত লিখিতে লাগিল। এক তাড়া কাগজ লেখা হইলে সেই কাগজগুলি আলাসিঙ্গার হাতে দিয়া পিশাচ-সিদ্ধ বলিল যে, প্রত্যেক কাগজে, প্রত্যেক পাতায় উহার নাম সহি করিতে বল। আলাসিঙ্গা সেই কাগজগুলি আনিয়া স্বামীজীকে নাম সহি করিতে বলিলে তিনি তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

পিশাচ-সিদ্ধের স্বামীজীর বিষয় বলা—আলাসিঙ্গা সেই কাগজগুলি পড়িয়া স্বামীজীকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল যে, "আগেকার নাম নরেন্দ্রনাথ। পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত, মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। মাতা এখন জীবিতা আছেন কোন অসুখ হয় নাই। স্বামীজীর জন্ম ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ২১ বৎসরে পিতৃ-বিয়োগ হয়, তাহার পর সংসারে অনেক কষ্ট হয়। তদনন্তর গুরুর বিশেষ আশ্রয় পান ও অনেক শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন। মনে একটা আতঙ্ক হইয়াছে যে, গুরু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু গুরু অলক্ষিত-ভাবে সর্বদাই কাছে আছেন ও রক্ষা করিতেছেন। বিপদের দিন কাটিয়া যাইবে ওমুক মাস থেকে শুভ দিন আসিবে। বহুদূরে সমুদ্র যাত্রা করিতে হইবে। তাহার পর বিশ্ববিজয়ী ও জগৎ বিখ্যাত হইবেন এবং অনেক হিতকর কার্য করিবেন। এই কাগজে লিখিত কথা যে সত্য ইহার প্রমাণস্বরূপ স্বামীজী অমুক ফুল তুলিয়া লইয়া শুঁকিবেন এবং গুন্‌গুন্ করিয়া নিজের ভাষায় একটি গান করিবেন।" এইরূপ অনেক কথা লেখা ছিল। স্বামীজী ও আলাসিঙ্গা প্রভৃতি সকলে সেই কাগজগুলি পড়িয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলেন কারণ, নাম, ধাম ও পূর্ব ঘটনা সমস্তই ঠিক মিলিয়া গিয়াছিল।

পিশাচ-সিদ্ধের পূর্বজীবন বলা—তাহার পর স্বামীজী আলাসিঙ্গার মারফৎ পিশাচ-সিদ্ধকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তখন সে কারণের বোতলটি অনেকটা খাইয়াছে ও একটু প্রফুল্ল হইয়াছে। সঙ্গে তার একটি স্ত্রীলোক ছিল তখন সে সরিয়া যাইল। পিপাচ-সিদ্ধটি বলিতে লাগিল, 'সে পূর্বে নিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং বালক অবস্থায় একদল সাধুর সহিত মিশিয়াছিল। একজন সাধুর বিশেষ সেবা করায় তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে জপ ধ্যানের কতকগুলি প্রক্রিয়া শিখাইয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল সেইভাবে জপ করিবার পর তাহার ভিতর একটা শক্তি উৎপন্ন হইল কিন্তু পূর্বের নিষ্ঠা তখন চলিয়া যায়। কেউ কিছু প্রশ্ন করিলে কারণপ্রিয় ও বামাচারি পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব

অভ্যাস মত ধ্যান করিতে থাকিলে সম্মুখে একটি মূর্তি দেখিতে পায়। সেই মূর্তিটি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া যায় আর সে সেইগুলি কাগজে লিখিয়া লয়। কখন কখন দুষ্ট মূর্তিটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, তখন সে একটি শ্লেটে অঙ্কের তেরিজ কষিতে আরম্ভ করে। তখন তাহাতেই তাহার মন নিবিষ্ট হইয়া যায় এবং মূর্তিটি তখন স্পষ্ট হইয়া প্রতীয়মান হয় এবং সমস্ত কথা বলিয়া দেয়। ইহা ছাড়া সে বিশেষ কিছু জানে না।' সেই সমস্ত কথা শুনিয়া স্বামীজী আবার ফিরিয়া আসিলেন।

মুনসী জগমোহনলালের সহিত সাক্ষাৎকালে বর্তমান লেখক সেই পিশাচ-সিদ্ধের কথা মুনসী জগমোহনলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মুনসী জগমোহনলাল বলিলেন, তাহাকে দশ টাকা ও এক বোতল মদ দিতে হয়। কিন্তু মুনসী জগমোহনলালের বিষয় সে যে সকল কথা বলিয়াছিল তাহা সকলগুলি ঠিক হয় নাই। অতীত ও ভবিষ্যতের কথার ভিতর কিছু মিলিয়া ছিল বটে কিন্তু অনেক স্থলেই মিল হয় নাই। এই জন্য মুনসী জগমোহনলাল সেই পিশাচ-সিদ্ধটির উপর আস্থা বিশেষ প্রকাশ করিলেন না।

স্বামীজীর মন এতদিন ধরিয়া বড়ই বিষণ্ন ছিল। তাঁহার জীবন যে ব্যর্থ হইয়াছে এইটি তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কিন্তু পিশাচ-সিদ্ধের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইতে লাগিল ও মনে প্রবলশক্তি আসিতে লাগিল। চিকাগোর ধর্ম সভায় যাইতে তাঁহার মনে এক নূতন ভাব উঠিল এবং ক্রমেই তাঁহার ভিতরে গাম্ভীর্য ও সিংহবল আসিতে লাগিল।

পি, সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার—পি, সিঙ্গারাভেলু মুদালীয়ার খৃষ্টান কলেজের একজন বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। আলাসিঙ্গার পরম বন্ধু এই জন্য স্বামীজীর কাছে আসিতে লাগিলেন ও স্বামীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য হইলেন। তিনি কিছুদিন ফল ও দুগ্ধ খাইয়াছিলেন সেইজন্য সকলে তাহাকে "কিডি" বা টিয়া পাখী বলিত এবং তিনি সেই

নামেই বন্ধু বান্ধবের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। কিডি অত্যন্ত বালক স্বভাব ও ভাবপ্রবণ ছিলেন। কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় কাঁদিয়া ফেলিতেন। প্রগাঢ় ভক্তি এবং কি করিয়া লোকের সেবা করিবেন এইটি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; কর্ম ও জ্ঞানভাব অপেক্ষা সেবা ভাবটা তাঁহার ভিতর বেশী ছিল। তিনি বর্তমান লেখককে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কি ভালবাসাপূর্ণ অমায়িক ভাব ছিল। যেন স্বামীজীর প্রতি তাহার প্রাণটা গলিয়া গিয়াছে এবং প্রাণের গভীর স্থান হইতে সে ভাব উঠিতেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে পত্রগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্তমান লেখক ও কিডি—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে বর্তমান লেখক মাদ্রাজে যাইয়া দুই ঘণ্টা ছিলেন। কিডি আধ ঘণ্টার ভিতর স্বামীজী সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল। কিডি বলিয়াছিলেন, স্বামীজীর ভাব সর্বতোমুখী। একবার কথা উঠিল যে কি করিয়া হরিণ শিকার করা হয়। স্বামীজী বলিলেন, 'মনটাকে একাগ্র করিয়া যদি বন্দুক হরিণের দিকে রাখা যায় তা'হলে গুলি অব্যর্থ ভাবে হরিণকে লাগবে।' এইরূপ কথার পর স্বামীজীর একদিন শিকার করিবার ইচ্ছা হইল। কোন একস্থানে তাহারা কয়জন মিলিয়া হরিণ শিকার করিতে যাইলেন। স্বামীজী প্রথম যৌবনকালে কুস্তি, জিম্‌নাষ্টিক্, তলোয়ার ও লাঠি খেলা শিখিয়াছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া কখনও সে বিষয়ের চর্চা করেন নাই। স্বামীজী যখন মাঠে যাইয়া বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন তখন স্বতন্ত্র ব্যক্তি! তাঁহার সাধু ভাব যাইয়া ক্ষত্রিয় ভাব দাঁড়াইল; হাতের বন্দুক একবারও কাঁপিল না, দৃষ্টি ঠিক করিয়া লইলেন এবং এমন ভাবে গুলিটি ছুঁড়িলেন যে হরিণটির পায়ে গিয়া বিঁধিল ও হরিণটি পড়িয়া গেল। কিডি আহ্লাদ করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "স্বামীজীর অব্যর্থ সন্ধান ছিল। পাকা শিকারী যেরূপ ভাবে শিকার করে তিনিও সেইরূপ ভাবে শিকার করা সেইদিন দেখাইয়া দিলেন।"

স্বামীজীর শাড়ী কাপড় পরিধান করিয়া নৃত্য করা—কিডি আর একটি গল্প বলিয়াছিলেন। একদিন স্বামীজী সন্ধ্যার সময় বসিয়া নৃত্য-গীতের কথা বলিতেছিলেন। নৃত্য বা হস্তপদাদি সঞ্চালনে যে মানসিক নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করা যায় তাহাই তিনি উপস্থিত সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বিষয় বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি উত্তেজিত হইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'একখানা শাড়ী কাপড় নিয়ে এসোতো। কাপড়খানি আনা হইলে তিনি নিজ গৈরিক বসনের উপর সেই শাড়ী-খানি স্ত্রীলোকের ন্যায় পরিয়া লইলেন। তখন তিনি যে সাধু বা পুরুষ মানুষ সেইটি ভুলিয়া গিয়াছেন এবং নিজে স্ত্রীলোক এইটি ধারণা হইল। অবিলম্বে বাইজীর ন্যায় হস্তাদি সঞ্চালন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নানারূপ ভাবভঙ্গি ও অঙ্গাদি পরিচালন করিয়া বাইজীর ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে স্বামীজীর সেই ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া রহিল। বাদ্যের সহিত কোন জায়গায় তাল কাটিয়া যাইল না। গৃহমধ্যে যেন কোন শিক্ষিতা বাইজী আসিয়া গান করিতেছে সেইটি সকলে অনুভব করিতে লাগিল। কিডি বলিয়া ছিলেন, "ভাবের সহিত সহসা শরীরকে পরিবর্তন করা স্বামীজী অদ্ভুতরূপে দেখাইয়াছিলেন।"

তাহার পর কিডি সাধারণ লোকদিগের প্রতি ভালবাসা, কি করিয়া তাহাদের কল্যাণ ও উন্নতি হইবে সেই সমস্ত বিষয়ে কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুনরায় কিডি বলিতে লাগিলেন, গরীব দুঃখীর কোন কষ্ট দেখিলে স্বামীজীর মুখ রূপান্তরিত হইয়া যাইত, অনেক সময় তিনি বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন ও তাঁহার চক্ষুতে জল দেখা যাইত।

মাদ্রাজ হইতে স্বামীজীর পত্র লেখা—এই সময় মুনসী জগমোহন-লাল মাদ্রাজে স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসেন এবং সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট স্বামীজীর পত্রাদি আসিতে লাগিল। প্রত্যেক পত্রখানি ভালবাসা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকের নাম করিয়া খবরাখবর লওয়া এবং তিনি যে এইবার একটা বিশেষ কিছু কার্য

করিবেন তাহারই পূর্ব সূচনা দেখা যাইতেছিল। একবার একখানি পত্র আসিল যে তিনি হায়দ্রাবাদে যাইতেছেন, পাঁচ ছয় দিন বাদে পুনরায় মাদ্রাজে ফিরিবেন। খেতড়ির রাজা অজিত সিংয়ের দয়া-দাক্ষিণ্য সেবা ও গুরুভক্তি প্রভৃতির নানা সুখ্যাতিপূর্ণ পত্র আসিতে লাগিল। রাসমণির জামাতা মথুরচন্দ্র বিশ্বাস যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবা করিয়াছিলেন রাজা অজিত সিংও স্বামীজীকে সেইরূপ ভাবে ভক্তি করিতেন।

মাদ্রাজ হইতে একখানি পত্র আসিল যে স্বামীজী আমেরিকায় চিকাগো মহাসভায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যাওয়া কতদূর সম্ভব হইবে এবং যাইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল, সেইজন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন। স্বামীজী কথাটি অতি গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া এই সকল কথা শরৎ মহারাজ, যোগেনমহারাজ, সান্ন্যাল মহাশয় ও বর্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহই জানিত না। অপরের কাছেও এ বিষয়ে উল্লেখ করা হইত না। যাহা হউক এই সময় হইতে স্বামীজীর আমেরিকা যাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

স্বামীজী ও কৃষ্ণ মেনন—লণ্ডনে অবস্থানকালে কৃষ্ণমেনন নামক জনৈক মাদ্রাজী যুবক স্বামীজীর নিকট যাইত। একদিন স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "দেখ আমি এই মেননের দেশে গেছলুম। সেই সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে গিয়ে দেখি যে এক বীভৎস কাণ্ড! মেয়েদের কোমর পর্যন্ত কাপড় পরা আর উপরকার অঙ্গটা একেবারে খোলা। আরে ছি! ছি! দেখে লজ্জা কর্তে লাগলো।" মেনন বলিত, "স্বামীজী যখন মাদ্রাজের দিকে ছিলেন তখন আমি তাঁহার কোল্কেতে তামাক ভোরে দিতুম, এইটাই ছিল আমার প্রধান কাজ।" মেনন কথাটি এমন বুক ফুলাইয়া গর্ব করিয়া বলিল যে বর্তমান লেখক তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মেননের ভক্তিপূর্ণ কথাটি শুনিয়া বুঝা গেল যে, স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া খাওয়ানই তাহার সর্ব কার্য

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য এবং তাহার সৌভাগ্য যে সে সেই কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছিল।

স্বামীজী ও অলকট্—একদিন স্বামীজী কর্ণেল অল্কটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সঙ্গে মেনন ও জনকতক লোক ছিল। স্বামীজীর মুণ্ডিত মস্তক ও মাথায় পাগড়ি। অল্কটের সহিত নানাপ্রকার কথাবার্তা কহিতে কহিতে স্বামীজী মৃদুভাব হইতে ক্রমশঃ কঠিনভাব ধারণ করিলেন, অবশেষে অল্কটকে ধমকাইতে সুরু করিলেন। স্বামীজী নির্ভীক ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমি কতকগুলি ভূতুড়ে ধর্ম চালাচ্ছ কেন? তোমার মহাত্মারা উড়ে যাচ্ছে, উড়ে আসছে, মাথার পাগড়ি রেখে যাচ্ছে, এ সব কি কচ্ছ? আর যত আহাম্মক মাদ্রাজী ছোঁড়াদের মাথা খাচ্ছ। তুমি হিন্দুধর্মের কি জান? যত বাজে ধূয়ো তুলেছ।" এইরূপ ভাবে তীব্র ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন। মেনন ও তাহার সঙ্গীরা স্বামীজীর ভৎ'সনা শুনিয়া স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া রহিল। কিয়ংক্ষণ পর স্বামীজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শান্ত ও গম্ভীর হইয়া তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার বিষয় অল্কটকে জ্ঞাপন করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার তো আমেরিকায় অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন তাঁহাদের নিকট পরিচয় পত্র দাও না?" অল্কট একটু মৌন হইয়া থাকিয়া পরিচয় পত্র দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন স্বামীজী পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের মস্তকোস্থিত পাগড়ি উন্মোচন করিয়া অল্টকে বলিলেন, "এই একটা নেড়া মাথার কাছে তোমার বিশ হাজার থিওসফিষ্ট দাঁড়াতে পারে না। এই গেরুয়া পরা নেড়া মাথাগুলি রাজাদের উপর কথা চালায় আর সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যত হিন্দু আছে তাদের গুরু হয়ে আদেশ চালাচ্ছে।" মেনন বলিতে লাগিল যে স্বামীজী যখন এই কথাগুলি অলকট্‌কে বলিতেছিলেন তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিক্ষা বাহির হইতে লাগিল। উপস্থিত সমস্ত লোকই হতভম্ব হইয়া রহিল এবং সন্ন্যাসীর কি উচ্চ আদর্শ ও অদ্ভুত শক্তি তাহাই সকলে সেদিন নূতন ভাবে দেখিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক

নয়,— জগৎ গুরু। এই ভাবটি তিনি যেন সেদিন সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে স্বামীজী একটু—হাসিতে হাসিতে অলকটকে বলিলেন, "অনেকক্ষণ বকিয়েছ, দাও গোটা কতক চুরুট দাও টানি।" এই বলিয়া গোটা পাঁচ ছয় চুরুট লইয়া হাসিতে হাসিতে সঙ্গের লোক-গুলিকে লইয়া চলিয়া আসিলেন এবং রাস্তায় অনেক কৌতুক ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী ও মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ—মেনন জাতিতে অব্রাহ্মণ ছিলেন সেইজন্য মাদ্রাজ দেশের ব্রাহ্মণেরা মেননের জাতিকে শূদ্র বা তদনুরূপ মনে করিয়া তাহাদের সাথে আহারাদি করিতেন না। একবার কতক-গুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামীজীর সহিত নানা বিষয় কথা কহিতে লাগিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাহারা স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামীজী আপনি কি জাতি?" স্বামীজী গম্ভীর হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "I belong to king maker caste" (যে জাত রাজা সৃষ্টি করে আমি সেই জাতের লোক।) সন্ন্যাসীর আদেশে রাজা সিংহাসনে বসেন, সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকিলে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করিলে রাজা সিংহাসনচ্যুত হন এই ভাবের কথা বলিলেন। স্বামীজীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা নির্বাক হইয়া রহিলেন, পুনরায় আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না।

স্বামীজীর প্রতি ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষ—স্বামীজী আমেরিকায় যাইবেন, মাদ্রাজে এই খবর প্রচারিত হইলে ব্রাহ্মণদিগের ভিতর অনেকেই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইলেন এবং নানা প্রকার আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। একবার স্বামীজী কয়েকজন অন্তরঙ্গ লইয়া মাদ্রাজের বন্দরের উপর বসিয়া বৈকালবেলা বায়ু সেবন করিতেছিলেন সেই সময় কতকগুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামীজীকে অনেক কটূক্তি করিয়াছিল।

স্বামীজী আলাসিঙ্গা নামটি সংক্ষিপ্ত করিয়া কখন কখন আচিঙ্গা বলিতেন এবং আলাসিঙ্গার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল তাহাকে আহ্লাদ

করিয়া আচিঙ্গার ভাই চিচিঙ্গা বলিয়া ডাকিতেন। সেই ব্যক্তি চিচিঙ্গা নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিল। এই সময় আলাসিঙ্গা, কিডি, রঞ্জন রাও, আর, এ, কৃষ্ণচারিয়া প্রভৃতি অনেকেই স্বামীজীর অন্তরঙ্গের ভিতর হইয়াছিল। বেলগিরি আয়েঙ্গারও স্বামীজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। মাদ্রাজের অনেক শিক্ষিত যুবক স্বামীজীর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই তাঁহার যেন একটা মানসিক ভাবের পরিবর্তন হইল এবং সাহস ও জগতবিজয়ী শক্তি যেন সহসা তাঁহার ভিতর উদ্ভুত হইল।

স্বামীজীর মহীশূরে গমন ও জনৈক রাজ কর্মচারী—স্বামীজী মহীশূরে গমন করেন। মহীশূরের মহারাজা স্বামীজীকে বিশেষ সম্মান ও আদর করিয়াছিলেন। মহারাজার অভ্যাগত, এইজন্য সমস্ত বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বন্দোবস্ত করা হইল। স্বামীজী কোন্ বস্তু পছন্দ করিবেন বা লইবেন তাহার কিছু নিশ্চয়তা না থাকায় মহারাজা আপনার এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সঙ্গে দিয়া এক বড় গাড়িতে স্বামীজীকে বসাইয়া বাজারে পাঠাইয়া দিলেন। যে কোন দোকানেই হউক বা যে রকমেব মূল্যবান দ্রব্যই হউক না কেন স্বামীজী পছন্দ করিয়া লইলেই সঙ্গের কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ দাম বুঝাইয়া দিবেন এইরূপ রাজাজ্ঞা ছিল। কর্মচারীটি বুঝিয়াছিল যে এইরূপ ক্রয়কার্যে তাহার বিশেষ কিছু অর্থলাভ হইবে, কারণ বোকা সন্ন্যাসী তো কোন জিনিসের দাম জানে না আর মহারাজ জিনিসের কত দাম তাহাও জিজ্ঞাসা করিবেন না। স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ি করিয়া কর্মচারীটি বাজারে জিনিস কিনিতে বাহির হইল। গাড়িখানি বড় বড় দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং সঙ্গিটি স্বামীজীকে লইয়া দোকানের ভাল ভাল জিনিস দেখাইতে লাগিল। স্বামীজী দ্রব্যগুলি দেখিয়া বেশ পরিতুষ্ট হইয়া ফেরৎ দিলেন এবং পুনরায় গাড়িতে আসিয়া বসিলেন। এইরূপে অনেক দোকানের জিনিস স্বামীজীর দেখা হইল। কিন্তু স্বামীজী কোন দ্রব্যই কিনিলেন না এবং সঙ্গিটিরও কিছু প্রাপ্য হইল না। অবশেষে একটি দোকানের

সামনে আসিয়া সঙ্গিটি বিনীতভাবে স্বামীজীকে বলিল, "স্বামীজী আপনার কোন জিনিস লওয়া উচিত, কারণ তাহা না হইলে আমি মহারাজকে কি বলিব?" তাহার কথা শুনিয়া স্বামীজী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক তো, চল এইবার গিয়া কিছু কিনিব।" এই বলিয়া একটা বড় চুরুটের দোকানে ঢুকিলেন। দোকানে ঢুকিয়া দোকানদারকে চুরুট দেখাইতে বলিলেন এবং চার পয়সা দামের একটা চুরুট লইয়া ধরাইয়া টানিতে টানিতে হাসিতে লাগিলেন এবং সঙ্গিটিকে বলিলেন, "এই লোকটির দাম দিয়া দাও।" তাহার পর তিনি গাড়িতে আসিয়া বসিয়া আবাসস্থানের দিকে গাড়ি চালাতে বলিলেন। তখন সঙ্গিটিকে স্বামীজী বলিলেন, "গ্যাখ, তোমাদের মহীশূরের সমস্ত বাজারটা আমি দেখে নিয়েছি, আমার নূতন দেখবার আর কিছু আবশ্যক নাই।" লোকটির কিছু প্রাপ্য হইল না সেইজন্য বিষণ্নমনে ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী শুধু দেখিয়া লইলেন যে মহীশূরের শিল্প কার্য কেমন হয়। স্বামীজী একভাবে সমস্ত দোকানগুলি দেখিলেন আর সঙ্গিটি আর একভাবে দোকানগুলি দেখিল। এই উপাখ্যানটি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিলাম।

স্বামীজীর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আশীর্বাদ লওয়া—মহীশূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী আমেরিকা যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। শ্রীযুত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য, রাজা বা জমিদারদিগকে অর্থের জন্য তার করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর অন্তরঙ্গ যুবকেরা প্রত্যেকই একমাস হইতে তিন মাসের বেতন দিতে শুরু করিলেন। রামনাদের (সেতুবন্ধ রামেশ্বর) মহারাজা প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন এবং খেতড়ির মহারাজের কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে। এইরূপে অর্থের বন্দোবস্ত হইলে স্বামীজী সান্যাল মহাশয়, শরৎ মহারাজ ও যোগেন মহারাজকে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর আশীর্বাদ লইবার জন্য পত্র লিখিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আশীর্বাদ করিলে স্বামীজী আমেরিকায় যাইতে স্থির হইলেন এবং এ

সকল কথা তখন আর কাহারও নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন বেলুড়ে নিলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে থাকিতেন।

স্বামীজীর বোম্বাইয়ে গমন—আলাসিঙ্গাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী বোম্বাইয়ে আসিয়া জাহাজের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে মুনসী জগমোহনলালও বোম্বাইয়ে আসিয়া স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বোম্বাইয়ে তখন কালীপদ ঘোষ, পাঠক মহাশয় ও হালদার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান লেখক বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে পাঠক মহাশয়ের নিকট নিম্ন লিখিত গল্পটি শুনিয়াছিলেন। স্বামীজীর একদিন ইচ্ছা হইল যে তিনি স্বহস্তে পোলাও রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইবেন। মাংস, চাল, খোয়া-ক্ষীর ইত্যাদি সকল প্রকার উপকরণ যোগাড় হইল। এদিকে আখ্‌নির জল তৈয়ারি হইতে লাগিল স্বামীজী আখ্‌নির জল হইতে সামান্য কিছু মাংস তুলিয়া লইয়া খাইলেন। পোলাও তৈয়ারি হইল। স্বামীজী মাংস কয়েকখানি খাইয়া অপর একটি ঘরে চলিয়া যাইয়া স্থির হইয়া ধ্যান করিতে বসিলেন—রান্নার কথা কিছু স্মরণ রহিল না। আহারের সময় সকলে স্বামীজীকে আহার করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী বলিলেন, "আমার খেতে কোন ইচ্ছে নেই তোমাদের একটা রেঁধে খাওয়ান উদ্দেশ্য ছিল সেইজন্য চৌদ্দ টাকা খরচ করে এক হাঁড়ি পোলাও রেঁধেচি; খাওগে, যাও।" এই বলিয়া তিনি আবার স্থির হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

হালদার মহাশয়—হালদার মহাশয়ের বাড়ি গিরিশবাবুর বাড়ির নিকটে ছিল এবং স্বামীজীর সহিত পুর্বেও বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ে কালীপদ ঘোষের বাসায় থাকিতেন। সেই সময় তাঁহার সাংসারিক অবস্থার স্বচ্ছলতা না থাকায় তিনি বোম্বাইয়ে আর্থিক উন্নতির জন্য গমন করেন। এক বৎসর পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গিরিশবাবুর বাড়িতে গিরিশবাবু, অতুলবাবু ও বর্তমান লেখককের সম্মুখে তিনি এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। স্বামীজী আলা-সিঙ্গাকে লইয়া বোম্বাইয়ে আসিলেন। সকলেই মহা আনন্দিত।

স্বামীজী আমেরিকায় যাইবেন, কেউ বা তাঁহার পরিচ্ছদাদির জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেউ বা সঙ্গে লইয়া যাইবার দ্রব্যাদির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেউ বা জাহাজের বন্দোবস্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন। সকলেই স্বামীজীর সহিত কথা-বার্তায় বড় পরিতুষ্ট হইলেন এবং সমস্ত জিনিস-পত্তরের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

বোম্বাইয়ে স্বামীজীর কইমাছ খাইবার ইচ্ছা—স্বামীজীর যাহাতে জাহাজে কোন অসুবিধা না হয় সেই জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা আনন্দের সোরগোল পড়িয়া গেল। হঠাৎ একদিন স্বামীজীর কই মাছ খাইতে ইচ্ছা হইল। বাজারে কিন্তু কই মাছ পাওয়া যায় না। কালীপদবাবু সন্ধান করিয়া রেলে করিয়া লোক পাঠাইয়া কোন স্থান হইতে গোটা কতক কই মাছ আনাইলেন। সকলেই মহা আহ্লাদিত ও আশ্চর্যান্বিত হইল কারণ ঐ সব দেশে কইমাছ দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান লেখক হালদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই মাছ কিরূপ করিয়া পাইলেন?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "সে একটা যোগাযোগ কিরূপ হইয়াছিল।" তাহারপর হালদার মহাশয় নিজের অবস্থা অকপটভাবে বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার অবস্থা সে সময় বড়ই কষ্টের ছিল। একদিন স্বামীজীকে একাকী পাইয়া তাঁহার সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। স্বামীজী বড়ই ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন। স্বামীজী হস্তস্থিত সরু বেত (যাহা তিনি ছড়ির ন্যায় ব্যবহার করিতেন) সেইটি হালদার মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন, "এইটি তুমি রাখিয়া দিও, ইহাতেই তোমার লক্ষ্মী হইবে।" হালদার মহাশয় গিরিশবাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার হস্তস্থিত সেই বেতটিকে দুই তিনবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন যে, সেই সময় হইতে তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হইল এবং বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। স্বামীজীর প্রদত্ত এই ছড়িটিই তাঁহার লক্ষ্মী।

জাহাজে স্বামীজীর বিদেশ গমন ও মুনসী জগমোহন লালের সহিত কথা—স্বামীজীর জাপানে যাইবার জন্য পি এণ্ড ও কোংএর এস এস পেনিনসুলা জাহাজে প্রথম শ্রেণীর টিকিট লওয়া হইল। মুনসী জগমোহনলাল, আলাসিঙ্গা এবং আরো কয়েকজন ব্যক্তি জাহাজে তুলিয়া দিতে সঙ্গে যাইলেন। স্বামীজীর আর গৈরিক বসন, নগ্ন পদ নাই; জুতা ও বুট পরিয়াছেন, ট্রাউজার পরিয়াছেন এবং একটি লম্বা কোটও পরিধান করিয়াছেন। স্বতন্ত্র ব্যক্তি, স্বতন্ত্র ভাব। স্বামীজী উন্মনা দ্বিমনা হইয়া জাহাজের ডেকে পায়চারি করিতেছেন এবং একবার ভারতবর্ষ ও একবার আমেরিকা তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে আসিতেছে। কখন বা তিনি ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছেন. কখন বা স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন, মাঝে মাঝে একটা চুরুট লইয়া টানিতেছেন কিন্তু কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না। মুনসী জগমোহনলাল স্বামীজীকে পূর্বে সন্ন্যাসীর বেশে দেখিয়াছিলেন এখন কিন্তু অন্য বেশে দেখিলেন। মুনসী জগমোহনলালের ধারণা ছিল যে তিনি নিজে রাজ তরফ হইতে অনেক ইংরাজের সহিত মিশিয়াছেন সেইজন্য ট্রাউজার জামা বুট পরা প্রভৃতি প্রথা তাহার বেশ ভাল রকম জানা আছে। সেইজন্য স্বামীজীকে সর্তক করিয়া ট্রাউজার পরিবার প্রথা শিখাইয়া দিতে লাগিলেন। স্বামীজীর ট্রাউজার পায়ের শেষটা জুতার গোড়ালীতে ঠেকিয়াছিল। মুনসী জগমোহনলালের ধারণা ছিল যে ট্রাউজারের শেষটা জুতা হইতে দুই তিন আঙ্গুল উঁচুতে থাকিবে কারণ তা না হইলে ভিতরকার মোজা দেখিতে পাওয়া যায় না সেইজন্য স্বামীজীকে অনবরত সতর্ক করিয়া দিতে লাগিলেন, "স্বামীজী ট্রাউজারটা ঐ গোড়ালীতে ঠেকিল, একটু উঁচু করে পরুন।" স্বামীজী কিন্তু আপন মনে পায়চারি করিতে লাগিলেন, কথাটা তত কানে যায় নাই। মুনসী জগমোহনলাল বারংবার বলিবার পর কথাটা স্বামীজীর কানে যাইল এবং একটু যেন তাঁহার হুঁস হইল। তখন স্বামীজী মুনসী জগমোহনলালের কথা শুনিয়া নিজের পায়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুনসী জগমোহনলালের

দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আমি বাল্যাবস্থাতেই এইরূপ পোষাকে অভ্যস্ত, এ বিষয় আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার তোমার কোন আবশ্যক নেই।" কথাটি এমন তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়াছিলেন যে মুনসী জগমোহনলাল একটু অপ্রস্তুত ও ভীত হইয়া পশ্চাৎ দিকে হটিয়া আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন আর একটিও কথা কহিলেন না। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া যাইল। এই গল্পটি আলাসিঙ্গা বলিয়া ছিল।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

শিব ওঁ

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।